ভারতী মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাবলী

ধর্ম গ্রন্থমালা—৭ম সংখ্যা

দেবদেবীতত্ত্ব

১ম খণ্ড

হামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযোগেন্দ্র নাথ বেদান্ততীর্থ

লিখিত 'মুখবন্ধ' সম্বলিত

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল, এম্ এ, বি. এল

প্রণীত

প্রকাশক

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ শীল

শ্রীভারতী পাবলিশিং কোং

১৭০, রমেশ দত্ত স্ট্রীট্

কলিকাতা—৬

১৩৫৪

মূল্য (১ম খণ্ড, ১ম ভাগ) —
সাধারণের জন্য—টাকা ১॥০
সদস্য ও ছাত্রবর্গের জন্য—টাকা ১৶০

শ্রীভারতী প্রেস হইতে
শ্রীগৌরচন্দ্র সেন বি. কম.
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীভারতী পাব্‌লিশিং কো
১৭০, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট,
ও
ভারতী মহাবিদ্যাল
১, গৌরলাহা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

উৎসর্গ পত্র

দেবভূমি ভারতের আর্য-ঋষি-বংশধরদের নিত্যপূজ্য দেবদেবীগণের, যাঁহাদের কৃপা ও করুণায় ভারত আধ্যাত্মিকতায় জগৎ শ্রেষ্ঠ—পূত কাহিনী ও তথ্য সম্বলিত এইগ্রন্থ তাঁহাদেরই পূজার অর্ঘ্যরূপে উৎসর্গীকৃত

—গ্রন্থকার

সূচীপত্র

দেবদেবীতত্ত্ব

১ম খণ্ড, ১মভাগ

প্রথম প্রকরণ (আংশিক)

মুখবন্ধ

বিশেষ স্নেহভাজন শ্রীমান্ সতীশ চন্দ্র শীল কৃত "দেবদেবী তত্ত্ব" গ্রন্থখানির একটী মুখবন্ধ লিখিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছি। এবিষয়ে আমার বলিবার অনেক কিছু ছিল, কিন্তু গ্রন্থখানি কোন নির্দিষ্ট দিবসে প্রকাশের ব্যবস্থা থাকায় এবং আমাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লিখিতে হইবে ব্যবস্থা থাকায় আমার বক্তব্য সংক্ষেপেই শেষ করিব।

সুধীসমাজে ও পাঠকবর্গের নিকট গ্রন্থকারের পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। আর্য সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সম্বন্ধে গবেষণা ও দেশ-বিদেশে প্রচার উদ্দেশ্যে এবং ভারতীয় কৃষ্টির ভিত্তিতে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলনের জন্য তিনি যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন ও তকাংশে কৃতকার্যও হইয়াছেন তাহার জন্য তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা-াজন ও ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন এবং সুধী সমাজে তিনি সুপরিচিতও াছেন।

এই গ্রন্থের বিষয় বস্তু কি এবং ইহা প্রকাশেরই বা উদ্দেশ্য কি ৎসমুদয় গ্রন্থকার তাঁহার ভূমিকায় বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। াশ্চাত্য ভাবাপন্ন কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তির মতে এবং সাধারণের ধ্যেও অনেকে ভ্রান্ত ধারণা করিয়া আসিতেছেন যে বর্তমানে হিন্দুদের

কোন কোন দেবদেবী হয় অনার্যদের নিকট হইতে গৃহীত, কিংবা বৌদ্ধ-ধর্ম বা বৌদ্ধতন্ত্রাদির বা অন্য কোন ধর্মে প্রচলিত উৎসবাদি হইতে গৃহীত। গ্রন্থকার সেইসব বিষয় খণ্ডনে প্রয়াস করিয়াছেন এবং বর্তমান হিন্দুধর্মের ধর্মকৃত্যাদি যে বেদমূলক এবং বেদেই যে তাহাদের বীজ সূক্ষ্মাকারে ছিল তাহা প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন এবং আমাদের মতে কৃতকার্যও হইয়াছেন।

পুস্তকের সম্পূর্ণাংশ আমার হস্তগত হয় নাই। তবে বর্তমান হিন্দুসমাজ যেরূপ বিভ্রান্তিকর ও প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে এবং হিন্দুসমাজের এই অবস্থায় যখন দেবদেবীর অর্চ্চনা, আরাধনা ও তদ্বিষয়ে বিশ্বাস অপেক্ষা মানুষের পূজাই অধিক আরম্ভ হইয়াছে, তখন গ্রন্থকার মহোদয় প্রাচীন আর্যসংস্কৃতির উপর অবিচলিত বিশ্বাস রাখিয়া তৎ-পরিপূর্ণতার নিদর্শন এই দেবদেবীগণের তত্ত্বের আলোচনার প্রয়াস ও শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা কেবল যে প্রশংসনীয় তাহা নহে, আর্য সংস্কৃতি ও সনাতন হিন্দুধর্ম্মের ধারাকে বর্ত্তমান অবিশ্বাস ও ধর্ম্মমূঢ়তার কুজ্ঝটিকার মধ্যে উজ্জ্বল রাখার অন্যতম উপায়। প্রয়োজনবশে অদ্বিতীয় অনন্ত শক্তির উৎকট ভাবনা ও বিভিন্ন ভেদ পরিকল্পনাই বিভিন্ন দেবদেবীর আকৃতি ও প্রকৃতি কল্পনার মূলীভূত কারণ। ঋষিগণ বলিয়াছেন—

'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্ত্য-
গ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ। ঋ. সং—২।৩।২২

অর্থাৎ ঋষিগণ একই সদ্‌বস্তুকে অগ্নি, যম, বায়ু প্রভৃতিরূপে পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং সেই পরিকল্পনার মূলেই হিন্দুদেবদেবীগণের

প্রকাশ। হিন্দুর সমস্ত দেবদেবীর পরিকল্পনা বেদের মধ্যেই রহিয়াছে। পুরাণগুলি তাহার অনুবাদ করিয়াছে মাত্র। বৌদ্ধগ্রন্থগুলির মধ্যে যে সমস্ত হিন্দু দেবদেবীর সম্বন্ধে উল্লেখ রহিয়াছে, সেই-গুলি বৌদ্ধগণের পরিকল্পিত দেবদেবী বলিয়া গবেষকগণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ সেইগুলির প্রত্যেকটীর পরি-কল্পনা যে বেদের মধ্যে রহিয়াছে, তাহা প্রমাণ ও স্থল নির্দ্দেশ পূর্ব্বক প্রদর্শন করা গ্রন্থকারের একান্ত প্রয়োজন। গ্রন্থকার কোন কোন স্থলে বৌদ্ধমতবাদগুলির কেবলমাত্র উল্লেখ করিয়া সেইগুলি মানিয়া লইতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাই পর্য্যাপ্ত নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের স্বকপোল কল্পিত সেই বৌদ্ধবাদগুলি যে ভ্রান্ত এবং সেই সমস্ত ভ্রান্তবাদের মূল ভিত্তি যে মূল বৈদিক সংহিতার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার অভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া দেওয়া উচিত, অন্যথায় এই সমস্ত দুষ্টমতবাদ দৃঢ়মূল হইয়া পরগাছার ন্যায় ক্রমশঃ হিন্দুসমাজের আস্তিক্য বুদ্ধিকে শতধাবিদীর্ণ করিয়া দিবে। ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে বৌদ্ধযুগের সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে বৈদিকসংহিতা ও সভ্যতার যুগ আরম্ভ হইয়াছে এবং সেই বৈদিকসাহিত্যগুলির মধ্যে উল্লিখিত দেবদেবীর আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে যদি বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লেখ থাকে, তাহা হইলে সেই সমস্ত পরিকল্পনার মূলে বৌদ্ধদের কোনও কৃতিত্ব নাই—ইহার সুস্পষ্ট উদাহরণস্বরূপ পুরীর জগন্নাথদেবের দারুব্রহ্মমূর্ত্তি সম্বন্ধে উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুপ্রাচীন ঋক্ সংহিতার মধ্যেই রহিয়াছে—

অদো যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপূরুষম্।
তদারভস্ব দুর্হণো তেন গচ্ছ পরস্তরম্॥ ঋঃ সং ৮।৮।১৩

সুতরাং বৈদিক যুগ হইতে এই দারুব্রহ্ম মূর্ত্তির যদি উপাসনা হইয়া থাকে তাহা হইলে তথায় বৌদ্ধ প্রভাব পরিকল্পনা প্রভৃতি কুকল্পনার অবকাশ কোথায়? তাছাড়া কোঙ্গদ অর্থাৎ প্রাচীন পুরী ও তৎসন্নিহিত স্থান-সমূহে আর্যসংস্কৃতির প্রভাবের ফলে যে বৌদ্ধধর্ম খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই এবং এই স্থল যে আর্যসংস্কৃতির দুর্ভেদ্য কেন্দ্রস্থল ছিল, তাহার ইঙ্গিত বৌদ্ধপরিব্রাজক হুয়েন্থ সাংএর উক্তি হইতেও পাওয়া যায়।

দেবদেবী সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে সমস্ত নির্বচন দিয়াছেন, সেই নির্বচনগুলি পুরাণানুযায়ী হইয়াছে বটে, কিন্তু অনেকস্থলে দার্শনিক দৃষ্টিতে তত্ত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। তত্ত্বগুলির মূল পরি-কল্পনা দার্শনিকদৃষ্টিতে বিশদভাবে আলোচনা করিয়া তদনন্তর পৌরাণিকধারার উল্লেখ করিলে ভাল হইত। তবুও সর্ব্বসাধারণের অবগতির পক্ষে আলোচনাগুলি যে চিত্তাকর্ষক হইবে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। উদাহরণস্বরূপ—কালীর নির্ব্বচন করিতে গিয়া গ্রন্থকার্ বলিয়াছেন কাল (কৃষ্ণবর্ণ) + ঙীষ্ = কালী অর্থাৎ ইঁহার বর্ণ কাল বলিয়া ইঁহার নাম কালী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। শৈবাগমে দেখা যায় যে পরমেশ্বরের সমবায়িনী (যা সা শক্তির্জগদ্ধাতুঃ কথিতা সমবায়িনী) স্বাতন্ত্র্য শক্তি যখন বিশ্বসৃষ্টিরূপে ক্রমব্যাপ্তা হন তখন তাঁহার নাম কালী। ক্রমার্থক কল্ ধাতু + ঘঞ্ = কালঃ। জাগতিক ভাবজাতকে পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ জ্ঞানবিষয়ীভূত করার শক্তির নাম

কাল। সেই কাল পরমেশ্বরের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে। এবং সেই শক্তির বহিরবভাসনকে কালী নামক শক্তি বলা হয়।

"তস্য ক্রমাক্রম কলনৈব কালঃ; সঃ পরমেশ্বরে এব অন্তর্ভাতি; তদ্ভাসনংচ।"

দেবস্য কালী নাম শক্তিঃ—তন্ত্রসার (অভিনবগুপ্ত প্রণীত)। ক্রম-ব্যাপ্ত বিশ্বসৃষ্টির পরে সর্ব্বসংহারে প্রবৃত্ত সেই শক্তি কৃষ্ণবর্ণা বলিয়া পরিকল্পিতা হন।

'ভেদভাবকমায়ীয় তেজোংহংশ গ্রসনাচ্চ যৎ।
সর্ব্বসংহারকত্বেন কৃষ্ণঃ তিমিররূপধৃক্।
—মালিনীবার্ত্তিকম্ ৩৭ পৃঃ

শ্রুতির মধ্যে কালীকে অগ্নির সপ্তজিহ্বার অন্যতম বলিয়া বলা হইয়াছে যথা—

কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী
লোলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ॥ মুণ্ডক ২।৪

শ্রুতিতেও রুদ্রকে অগ্নিস্বরূপ বলা হইয়াছে। সমস্ত দেবতাই একই পরমেশ্বরের শক্তি। প্রয়োজনবোধের ভাবনা হইতেই বিভিন্নরূপের পরিকল্পনা করা হইয়াছে—ইহার উল্লেখ আগেই করিয়াছি। শ্রীশ্রীদুর্গা সম্বন্ধেও একই কথা। আগমশাস্ত্রে এই সম্পর্কে উল্লেখ আছে:—

একৈবশক্তিঃ পরমেশ্বরস্য
ভিন্না চতুর্দ্ধা বিনিযোগকালে।

ভোগে ভবানী পুরুষেষু বিষ্ণুঃ
কোপেতু কালী সমরে চ দুর্গা ॥

অর্থাৎ সমরে উৎকট শত্রুর বিনাসাধনের উদ্দেশ্যে পরমেশ্বরশক্তি ভাবনা ভাবিত হইয়া শ্রীদুর্গারূপে প্রকট হন।

এইরূপে আলোচনা করিলে দেখা যায় সমস্ত দেবদেবীর স্বরূপতত্ত্ব আমরা বেদ ও বেদমূলক আগম শাস্ত্র হইতে পাই এবং আরও দেখিতে পাই যে সমস্ত দেবদেবীর পরিকল্পনা অমূলক নহে, সেইগুলির মূলে দার্শনিক যুক্তি সুনিহিত রহিয়াছে। প্রাচীন বৈদিকঋষিগণ যে দৃষ্টিভঙ্গীতে জগতের সমূহ কল্যাণের উদ্দেশ্যে এই সমস্ত দেবদেবীর ভাবনা ও তাঁহাদের অনুগ্রহ ও আবির্ভাব অনুভব করিয়াছিলেন, আজও সেই আস্তিক্য বুদ্ধিতে মানুষ যদি ভাবনা তৎপর হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের সেই প্রকার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিবে এবং তদ্বারা কুদৃষ্টি, কুকল্পনা প্রভৃতি তমসাদ্বারা সমাচ্ছন্ন বর্ত্তমানজগতে আলোক রেখার সন্ধান পাইতে পারিবে।

যাহা হউক ইহা বলা যহিতে পারে জগন্নাথদেব যে বৌদ্ধযন্ত্রের প্রতীক নহে, কালীমাতা যে অনার্যদের দেবতা হইতে আর্য-দেবতাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন তাহা নহে, সূর্যোপাসনা যে বহির্ভারত হইতে ভারতে প্রচলিত হইয়াছে তাহা নহে—এই সমস্ত বিষয় গ্রন্থকার সুন্দরভাবে প্রদান করিয়াছেন। হিন্দু জনসাধারণ বিশেষ আড়ম্বরের সহিত বৎসর যাবৎ নানা প্রকার দেবদেবীর পূজা ও উৎসবাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সব দেবদেবীর তত্ত্ব বা তথ্যমূলক বহু বিষয় তাঁহাদের জানা নাই। কারণ একাধারে

সমস্ত দেবদেবীর কাহিনী সম্বন্ধে আলোচনা কোন শাস্ত্রগ্রন্থে পাওয়া যায় না ; এতাদৃশ কোন গ্রন্থও বাংলাভাষায় প্রকাশিত হয় নাই।

তদ্ব্যতীত এই সব বিষয়ে পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য পণ্ডিত কর্তৃক যে সব গবেষণা হইয়াছে তাহাদেরও আলোচনামূলক কোন গ্রন্থ নাই। সুতরাং এই গ্রন্থ যে হিন্দু জনসাধারণের ও সাধারণ পাঠক-পাঠিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবে তাহা বলা যাইতে পারে। একটী গ্রন্থে এত দেবদেবীর আলোচনা থাকায় গ্রন্থকারকে অনেকস্থলে সংক্ষেপে তাঁহার বক্তব্য শেষ করিতে হইয়াছে, তবে সেই সকল স্থানে তিনি মূলগ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন ; যাঁহারা বিস্তারিতভাবে জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ঐ সব গ্রন্থ পাঠ করিতে পারিবেন। গ্রন্থকার ভূমিকায় দেবতা সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং ঐ বিষয়ের আমি আর কোন অবতারণা করিলাম না।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বৈদিক দেবতা ও যজ্ঞাদি সম্বন্ধে আলোচনা থাকিবে, কিন্তু শুনিলাম উহার পাণ্ডুলিপি এখনও প্রস্তুত হয় নাই। উহাকে পৃথক গ্রন্থরূপে প্রকাশ করাই সমীচীন মনে হয়।

ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রভাষা হইতেছে হিন্দী এবং হিন্দী ভাষাভাষীর সংখ্যাও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাভাষী অপেক্ষা বেশী, সুতরাং এই শ্রেণীর গ্রন্থের হিন্দীসংস্করণও একান্ত বাঞ্ছনীয়।

আমি আশাকরি গ্রন্থকার মহোদয়ের ঐকান্তিক ও আন্তরিক চেষ্টা বিভ্রান্ত জনগণের মধ্যে আস্তিক্যবুদ্ধি ও ভাবনার দৃঢ়তা আনয়ন

করিয়া তাহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করিবে এবং গ্রন্থকার দীর্ঘজীবী হইয়া এই শ্রেণীর অন্যান্য পুস্তক প্রণয়ন দ্বারা সনাতন ধর্মের জ্ঞান জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করুন, ইহাই কামনা করি।

১০ই ভাদ্র, ১৩৫৪
কলিকাতা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ

ভূমিকা

ভারতীয় রীতি অনুযায়ী প্রত্যেক গ্রন্থেরই প্রারম্ভে 'অনুবন্ধ-চতুষ্টয়' এর অবতারণা করা প্রয়োজন। ইহাকেই গ্রন্থের ভূমিকা বলা যাইতে পারে। 'অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন' এই চারিটী বিষয়ের প্রাথমিক বিবরণীই 'অনুবন্ধ চতুষ্টয়'।

আলোচ্য গ্রন্থের অধিকারী কাহারা? অর্থাৎ কাহাদের জন্য এই গ্রন্থ রচিত। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে আর্যধর্মাবলম্বী সাধারণ পাঠক-পাঠিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যই ইহা রচিত। পণ্ডিতমণ্ডলী মূল শাস্ত্রাদি পাঠের দ্বারা বক্তব্য বিষয় অবগত থাকিতে পারেন, সুতরাং তাঁহাদের জন্য ইহা রচিত নহে।

ইহার বিষয়বস্তু কি? ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মূল বেদ, কিন্তু বৈদিকযুগের ধর্মকৃত্যাদি—যাগযজ্ঞ ও সামগানাদি, পৌরাণিকযুগে দেবতাবিগ্রহের পূজা বন্দনাদিতে ক্রমাভিব্যক্ত হইল; আরও পরবর্তী তান্ত্রিক যুগে সংক্ষিপ্তভাবে নানাপ্রকার উপাসনাবিধি প্রচলিত হইল। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় বর্তমান কালে প্রচলিত উপাসনাদির বা ধর্মের সহিত বৈদিক ধর্মের বোধ হয় কোন সাদৃশ্য নাই। বর্তমানে প্রচলিত দেবদেবীর পূজাদির ধারণা যে বৈদিকশাস্ত্রেই অল্প বিস্তর বীজাকারে ছিল অর্থাৎ পৌরাণিক দেবদেবীর ধারণা ও উপাসনা বৈদিক ধর্মেরই যে ক্রমাভিব্যক্তি ও পরিণতি—তাহার আলোচনা এই গ্রন্থের অন্যতম বিষয়বস্তু। তারপর ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী আবালবৃদ্ধ-বণিতা বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত দেবতাদের

প্রতিমা আনয়ন দ্বারা পূজা ও উৎসব করিয়া থাকেন, কিন্তু এইসব দেবদেবীদের সম্বন্ধে তথ্যাদির জ্ঞান অনেকেরই নাই। তাঁহাদের মূর্তি-পূজা, পৌরাণিক কাহিনী, দার্শনিক তত্ত্ব, ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য তথ্যাদির সহিত সাধারণ পাঠকবর্গের পরিচয়-প্রদানই এই গ্রন্থের মুখ্য বিষয়বস্তু। পুরাণাদিতে তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী আছে, স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থে পূজাবিধি আছে, বিভিন্ন আগমে নানাপ্রকারের দার্শনিক ব্যাখ্যা ও ধাতুগত ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু একাধারে সংক্ষেপে এই সকল বিষয়ের বর্ণনা ও অন্যান্য তথ্যাদির সন্নিবেশ আছে এবম্প্রকার গ্রন্থ বাংলাভাষায় একান্ত বিরল। গোপীনাথ রাও কৃত ইংরেজী ৪টী বৃহৎখণ্ডে Elements of Hindu Iconography গ্রন্থে দেবদেবীদের মূর্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু বিষয় আছে। কিন্তু অন্যান্য তথ্য নাই। আলোচ্য গ্রন্থখানি সেই অভাব কতক পরিমাণে দূর করিবে আশা করা যায়।

বৈদিকযুগের বহু দেবতার স্থান পরবর্তী পৌরাণিক যুগের দেবগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়। বর্তমান কালে ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতির পূজা-প্রচলন নাই; তাঁহাদের স্থান পৌরাণিক দেবগণ কর্তৃক অধিকৃত

এই গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে সমাপ্ত হইবে এবং ইহার প্রথম খণ্ডে পৌরাণিকযুগে যে সব দেবতার পূজা ও উৎসব প্রচলিত তাঁহাদে বিষয়ই লিপিবদ্ধ হইবে। সমগ্র গ্রন্থখানিকে ৪টী প্রকরণে বিভক্ত কর হইয়াছে। প্রথম প্রকরণে নিম্নলিখিত দেবদেবীর তথ্যাদি থাকিে যথা—(১) গণেশ (২) সরস্বতী (৩) লক্ষ্মী (৪) কার্ত্তিকেয় (৫) দুগ (৬) কালী (৭) জগদ্ধাত্রী (৮) অন্নপূর্ণা (৯) বাসন্তী (১০) গঙ

(১১) জগন্নাথ (১২) বিশ্বকর্মা (১৩) ব্রহ্মা(১৪) বিষ্ণু (১৫) মহেশ্বর (১৬) অগ্নি (১৭) সূর্য (১৮) চন্দ্র (সোম)। ইহার দ্বিতীয় প্রকরণে এইসব দেবতাদেরই উৎসবপর্বাদির বিষয় থাকিবে, যেমন অক্ষয় তৃতীয়া, দশহরা, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলন, রাস, দোলযাত্রা প্রভৃতি ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্রতাদি। এই দুইটী প্রকরণ প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ইহার দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যে প্রথম প্রকরণে বৈদিক দেবতাদের ও দ্বিতীয় প্রকরণে বৈদিক যজ্ঞের বিষয় বর্ণিত থাকিবে। ইহার প্রথমখণ্ডের মধ্যে বৈদিক দেবতা অগ্নি, সূর্য, ও চন্দ্রের বিষয় থাকিবার কারণ এই যে বর্তমান যুগেও এই তিন দেবতার অনেক উপাসক আছেন এবং সেজন্য ইঁহাদিগকে বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের সংযোগকারী দেবতা বলা যাইতে পারে। প্রশ্ন হইতে পারে এত পৌরাণিক দেবতাদের মধ্যে এই কয়জনের মাত্র আলোচনা হইতেছে কেন? এবং জগন্নাথদেব ত বিষ্ণুরই পৃথক মূর্তি সুতরাং তাঁহারও আলোচনা কেন? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে, যে সব দেবতার পূজা ও উৎসব বর্তমান সনাতন ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা সংবৎসর যাবৎ অনুষ্ঠিত হয়, তাঁহাদেরই মাত্র বর্ণনা আছে। জগন্নাথদেব সম্বন্ধে অনেকের নানা প্রকার ভ্রান্ত ধারণা আছে, সেই জন্যই তাঁহার পৃথক্ আলোচনা।

ইহাই হইল গ্রন্থবর্ণিত বিষয়। সাধারণের জন্য এবং বিশেষতঃ আর্যধর্মাবলম্বীদের অনেকে যাঁহারা এইসব দেবদেবীর নিত্য বা নৈমিত্তিক পূজা করা সত্ত্বেও এই সব বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই বা জানেন না, তাঁহারা যাহাতে ইষ্টদেবদেবীর বিষয় সম্যগ অবগত হইয়া পূজাদি

কার্য ও উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে পারেন ও পূজাপর্বে সাধারণের অবগতির জন্য সভাদি দ্বারা সেই সেই পূজা বা পর্বের তথ্যাদি আলোচনা করিতে পারেন তদুদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ প্রণয়ন এবং ইহাই এই গ্রন্থের 'প্রয়োজন' অনুবন্ধ। প্রশ্ন হইতে পারে বৈদিক দেবতাদের বা যাগ যজ্ঞের আলোচনার প্রয়োজনীয়তা কি? কারণ বর্তমানে এই দেবতাদের পূজা বা স্তুতির প্রচলন নাই, বা যাগ যজ্ঞও অনুষ্ঠিত হয় না। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে বর্তমানের পূজা ও হোমাদির মূল বৈদিক যজ্ঞ। সুতরাং বৈদিক যজ্ঞের সাধারণ জ্ঞান থাকিলে এই সব পূজাপদ্ধতিও সহজে অনুষ্ঠান করিতে পারা যায়। আর বৈদিক যজ্ঞ পুনঃ প্রচলনের বা অনুষ্ঠানের সার্থকতা পূর্বেও যেমন ছিল এখনও তদ্রূপ আছে। জ্ঞানাভাবে ঐগুলি লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। প্রত্যেক দ্বিজেরই বেদপাঠ প্রাত্যহিক পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্যতম যজ্ঞ (ঋষি যজ্ঞ)। সুতরাং বৈদিক দেবতাদের ও যজ্ঞাদির সাধারণভাবে আলোচনা একান্ত প্রয়োজন এবং ২য় খণ্ডে ঐবিষয় গুলিই থাকিবে। কোন্ কোন্ দেবতা ও যজ্ঞ থাকিবে তাহা ঐ খণ্ডের প্রারম্ভেই বর্ণিত থাকিবে। বাংলা ভাষায় আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের 'যজ্ঞ কথা' এবং আরও দুই একটী গ্রন্থ মধ্যে সামান্য ভাবে আলোচনা ব্যতীত যজ্ঞ সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ নাই। জার্মাণ ভাষায় Hillebrandt কৃত বৈদিক যাগযজ্ঞ সম্বন্ধে একটী উপাদেয় গ্রন্থ আছে, সম্প্রতি ডঃ বটকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক উহা ইংরেজীতে অনুদিত হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত জার্মাণ ভাষায় ও অন্যান্য ভাষায় কোন কোন বৈদিক

দেবতা সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ইংরেজীতে Dr. A. B. Keith কৃত Religion & Philosophy of the Vedas নামক ২ খণ্ড গ্রন্থে এই বিষয়ের অনেক তথ্যও আছে। কিন্তু সংক্ষিপ্তভাবে এইসব দেবতার বা যজ্ঞের বর্ণনা বাংলা বা অন্য ভাষায় দৃষ্ট হয় না। সেই অভাব পূরণের জন্য ২য় খণ্ড রচনার প্রয়াস। এই খণ্ড প্রকাশে বিলম্ব হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক খণ্ডই স্বসম্পূর্ণ, সুতরাং বর্তমান খণ্ডের সেজন্য কোন মূল্য-লাঘবতা হইবে না।

গ্রন্থের সহিত বিষয়বস্তুর সম্বন্ধ কি? প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক সম্বন্ধ; অর্থাৎ প্রত্যেক দেবতার তথ্যাদি প্রদানই সম্বন্ধ।

এক্ষণে দেবতত্ত্ব সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিয়া এই ভূমিকার উপসংহার করিব।

বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার 'দেবতা' শব্দের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নিরুক্তকার যাস্ক লিখিয়াছেন—"দানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা যো দেবঃ সা দেবতা" অর্থাৎ দান ও দীপনহেতু যিনি স্বর্গস্থানীয় তিনি দেবতা (৭।১৫)। সায়ণাচার্য ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় দেবতা শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"তথা দেবনার্থ দীব্যতি ধাতুনিমিত্তো দেবশব্দ ইত্যেতদাম্নায়তে" অর্থাৎ দেবনার্থ দিব্‌ধাতু হইতে দেবশব্দ নিষ্পন্ন। 'দেব' শব্দের ধাতুগত অর্থ যিনি দ্যোত-মান্ বা দীপ্তিমান্ (দ্যোতনাদ্দেবঃ)। ঋগ্বেদের ঋষিরা সূর্য, চন্দ্র, প্রভৃতি প্রকৃতির এক একটী বিকাশের পশ্চাতে এক একটী দেবতার কল্পনা করিয়াছেন এবং বিভিন্ননামে তাঁহাদিগকে অভিহিত করিয়াছেন। তবে এক মহাদেবতা হইতেই যে সকল দেবতার উদ্ভব

এবং তিনিই যে বহুনামে কথিত তাহাও বেদের "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" এই উক্তি হইতেই তাঁহারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ঋগ্বেদের অনেক স্থানে ৩৩ জন দেবতার কথার উল্লেখ আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণে (১১৷৬৷৩৫) এই ৩৩ জন কে কে তাহা বর্ণিত আছে—৮ বসু, ১১ রুদ্র, ১২ আদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (২৷১৮) আবার ৩৩ জন সোমপায়ী ও ৩৩ জন সোমপায়ী নহে, মোট ৬৬ জন দেবতার কথা আছে। বৈদিক শাস্ত্রের অন্যত্র (ঋক্‌সং ৩৷৩৯ ও ১০৷৫২; শতপথ ব্রা. ১১৷৬৷৩৪ প্রভৃতি) ৩৩৩৯ জন দেবতার কথাও আছে। সায়ণাচার্যের মতে দেবতা ৩৩ জন, ৩৩৩৯ সংখ্যা তাঁহাদের মহিমাব্যঞ্জক। এই সব হইতে দেখা যায়, বৈদিক যুগে বহুদেবতা স্তুত হইতেন এবং তন্মধ্যে এই কয়জন দেবতা যথা—অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, ত্বষ্টা, বিষ্ণু, রুদ্র, যম, পর্জন্য, সোম, মরুৎগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিদ্বয় প্রভৃতি প্রধান এবং দেবীগণের মধ্যে সরস্বতী, সুনৃতা, ইলা, ইন্দ্রাণী, পৃথিবী উষা প্রভৃতি প্রধানা।

পরবর্তী পৌরাণিক যুগে আমরা আরও বহু দেবতার উল্লেখ দেখিতে পাই। পদ্মপুরাণে (উত্তর খণ্ড) দেবতার সংখ্যা ৩৩ কোটী পাই যথা—

"সদারা বিবুধাঃ সর্বে স্বানাং স্বানাং গণৈঃ সহ।
ত্রৈলোক্যে তে ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটিসংখ্যাতয়াঽভবন্॥

অর্থাৎ ত্রৈলোক্যে দেবগণ তাঁহাদের পত্নী ও নিজ নিজ গণ সহ সংখ্যায় ৩৩ কোটী।

সুতরাং দেখা যাইতেছে দেবতাদের পরিবারবর্গসহ সংখ্যা বহু। ইহাতে আশ্চর্য হইবারও কিছু নাই, কারণ পৃথিবীতে যেমন মানব-সংখ্যা স্বর্গেও তদ্রূপ বহু দেবতা। এবং এই প্রকার দেবতার সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান হইতে পারে, কারণ যাঁহারা সগুণ মুক্তি লাভ করিয়া স্ব স্ব ইষ্টদেবের (শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি) লোকে বাস করিতেছেন তাঁহারাও দেবপদবাচ্য। তাঁহাদিগকেই দেবতাদের 'গণ' বলা হয়।

মহাভারতের শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মে দেখা যায় এই সব দেবতাদেরও আবার বর্ণ (শ্রেণী) বিভাগ আছে, যেমন কোন দেবতা ব্রাহ্মণ—আঙ্গিরস দেবতাগণ, কোন দেবতা ক্ষত্রিয়—দ্বাদশাদিত্য, মরুদ্গণ বৈশ্য, অশ্বিদ্বয় শূদ্র ইত্যাদি। আবার কূর্মপুরাণাদিতে অধিকারী ভেদে দেবতাদেরও ভেদ বর্ণিত আছে, যেমন দেবতাদের দেবতা বিষ্ণু, দানবদিগের দেবতা মহাদেব, গন্ধর্ব ও যক্ষদের সোম, বিদ্যাধরদের সরস্বতী, যক্ষদিগের রুদ্র, কিন্নরদের পার্বতী, ঋষিদের ব্রহ্মা ও মহাদেব, ব্রহ্মচারীদের ব্রহ্মা, নৃপতিদের অগ্নি, আদিত্য, ব্রহ্মা ও মহাদেব ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই যে, যে শ্রেণীর সৃষ্টজীব যে প্রকার কার্যে রত; যে যে দেবতার মধ্যে তদনুযায়ী শক্তির বিকাশ তাঁহারাই তাহাদের দেবতা।

এই সব দেবতাদের মূর্তিপূজা কোন্ সময় হইতে ভারতে প্রচলিত হইল তাহা বলা কঠিন। বৈদিক যুগেই ইহার বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল এবং তাহা পৌরাণিক যুগে পল্লবিত হয়। পৌরাণিক যুগ কোন্ সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন। রামচন্দ্র ত্রেতাযুগের শেষে মূর্তিপূজা করিতেছেন এবং তখন ইহা বিশেষ ভাবে প্রচলিত।

তাহার পূর্বেও রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য মূর্তি নির্মাণ করিয়া দেবীপূজা করিতেছেন জানা যায়। রামচন্দ্রের সময় আমরা ৫৬৪১ পূঃ খ্রীঃ গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং তাহারও অন্ততঃ ১ হাজার বৎসর পূর্বে যে মূর্ত্তি-পূজা আরম্ভ হইয়াছে তাহা বলিতে পারা যায়। আধুনিক কোন কোন গবেষকের মতে বুদ্ধের সময় হইতে মূর্তিপূজা প্রচলিত হয়। ইহা যে ভ্রান্ত তাহা বলা বাহুল্য। মোক্ষমূলরের মতে (Chips from a German Workshop, Vol. I, পৃ ৩৫) বৈদিক সাহিত্যে মূর্তি-পূজার বীজ পাওয়া যায় না। আবার ডঃ বোল্লেনসন (Dr Bollenson) এর মতে 'দেবতাদের মানবের ন্যায় আকৃতি থাকায়' (ঋ. ৩।৪।৫) এই প্রকার নানা উক্তি হইতে বৈদিক যুগেই মূর্তিপূজার বীজ পাওয়া যায় (Jr. Germ. Oriental Society XXII, পৃঃ ৫৮৭)। এবিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন এবং আমাদের মতামত পূর্বেই উক্ত হইয়াছে।

মূর্তিপূজা যে কেবল মূর্তি নির্মাণদ্বারাই অনুষ্ঠিত হইত তাহা নহে। শালগ্রামশিলা, বাণলিঙ্গ, নানাপ্রকার যন্ত্র এই গুলিকেও মূর্তিপূজার প্রতীক বলা যাইতে পারে। এই যন্ত্র ধাতু বা অন্য পাত্রের উপর অঙ্কিত নানারকমের চিত্র এবং ইহাদের গভীর রহস্যমূলক ব্যাখ্যা আছে। এতদ্ব্যতীত গরু, গরুড়পক্ষী, গঙ্গা-গোদাবরী-সরস্বতী প্রমুখ নদী, অশ্বত্থবৃক্ষ ইত্যাদির সহিতও পূজাদির সম্বন্ধ আছে এবং ইহা-দিগকে বিশেষ পবিত্র বিবেচনা করা হয়।

মন্দিরাদির মূর্তিগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে—চল, অচল, চলাচল। যে সব বিগ্রহে উৎসব, দৈনিক অর্চনা ও

স্নানাদিকার্য হয় তাহা-'চল' এবং এইগুলিকে আবার ৫ শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে (বৈখানসাগম দ্রষ্টব্য)। এইগুলি সাধারণতঃ ধাতু নির্মিত। অচল বিগ্রহকে 'মূল বিগ্রহ' বা 'ধ্রুববেরা' বলা হয়। ইহা মন্দিরের মধ্যস্থলে স্থাপিত হয় এবং সাধারণতঃ বৃহদায়তন ও প্রস্তর নির্মিত হয়। ইহা আবার তিন শ্রেণীর হয়—স্থানক (দণ্ডায়মান), আসন (উপবিষ্ট) ও শয়ন। ইহাদের প্রত্যেকের আবার যোগ, ভোগ, বীর ও অভিচার এই ৪ প্রকার ভেদ আছে। এতদ্ব্যতীত মূর্তির রৌদ্র ও সৌম্য এই ২ প্রকার ভেদও আছে। বিগ্রহের আবার চিত্র, চিত্রার্ধ ও চিত্রাভাস এই প্রকার শ্রেণী আছে। যে মূর্তি সম্পূর্ণ অবয়ববিশিষ্ট তাহা চিত্র, যাহা আংশিক ব্যক্ত ও আংশিক লুপ্ত (যেমন প্রস্তরাদিগাত্রে খোদিত) তাহা চিত্রার্ধ, এবং বস্ত্র বা দেওয়ালে অঙ্কিত বিগ্রহ চিত্রাভাস শ্রেণীভুক্ত।

আগমাদিগ্রন্থে মূর্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে নানা তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। দৃষ্টান্তরূপে বলা যাইতে পারে, শয়ন মূর্তি—কোন্ দিকে দেবতার মস্তক থাকিলে কি ফল হয় তাহার বিবরণী আছে; যেমন যে শয়ন মূর্তির মস্তক পূর্বে, তাঁহার পূজায় শান্তি, পশ্চিমে পুষ্টি, উত্তরে আভিচারিক ফল ও দক্ষিণে জয়লাভ। কোন্ দেবতার পূজায় কি ফল হয় তাহাও আছে। কোন্ দেবতার প্রতিমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি কি পরিমাপের হইবে তাহা 'প্রতিমামানলক্ষণ' প্রমুখ গ্রন্থে আছে। প্রদেশাদিভেদে মূর্তির সামান্য ভিন্নতা দৃষ্ট হয়, তবে ইহা বাহ্যাকৃতির ও অলঙ্কারাদির প্রাদেশিক রুচি নিবন্ধন হইয়া থাকে। কাষ্ঠ, প্রস্তর, কোন ধাতু এবং এক বা ততোধিক

ধাতুর সংমিশ্রণ, মূল্যবান প্রস্তর যেমন স্ফটিক (সূর্য কান্ত বা চন্দ্র কান্ত), পদ্মরাগ, বজ্র (হীরক), বৈদুর্য, বিদ্রুম, পুষ্য, রত্ন প্রমুখ ; এবং মৃত্তিকা দ্বারা দেবমূর্তি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত হস্তীদন্ত এবং ইষ্টক (পোড়ামাটী) হইতেও মূর্তি নির্মিত হয়। মন্দিরের মধ্যে সাধারণতঃ 'ধ্রুববেরা' অর্থাৎ অচল মূর্তি প্রস্তরের এবং উৎসব, স্নপন ও বলি মূর্তি ধাতুর হইয়া থাকে ; আর বাৎসরিক নৈমিত্তিক পূজার প্রতিমাদি সাধারণতঃ মৃত্তিকার হইয়া থাকে।

দেবদেবীদিগের হস্তে সাধারণতঃ নানাপ্রকার আয়ুধ (অস্ত্র) থাকে। তন্মধ্যে এইগুলি প্রধান যথা—চক্র, গদা, খেটক, অঙ্কুশ, পাশ, টঙ্ক, বাণ, বজ্র, খড়্গ, মুসল, হল, শূল, ধনু ইত্যাদি। নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রও থাকে, যেমন, বীণা, বেণু (মুরলী), ডমরু, ঘণ্টা, শঙ্খ ইত্যাদি। পুষ্পের মধ্যে পদ্ম ও নীলোৎপল সাধারণতঃ হস্তে থাকে এবং মুদ্রার মধ্যে বরদা ও অভয় মুদ্রাযুক্ত দেবহস্তই সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়।

কোন্ কোন্ স্থানে মন্দির নির্মাণ কর্তব্য ও কোন্ দিকে কোন্ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য এইসব বিষয়ও শাস্ত্রাদিতে বিশদ্‌ভাবে বর্ণিত আছে। নদী বা জলাশয় তীরে, পাহাড়ের পাদদেশে বা উপরে, এবং গ্রামমধ্যে মন্দির প্রতিষ্ঠা কর্তব্য। যে ব্যক্তি যে মূর্তির উপাসক তাহার দ্বারাই তাহার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

এই যে বিগ্রহ পূজা ইহা যে মাত্র মূর্তিকে পূজা নহে তাহা বলা প্রয়োজন। ইহা দেবতার প্রতীকমাত্র। এই প্রতীকোপাসনা প্রায় সমস্ত ধর্মেই সাধারণতঃ অল্পবিস্তর আছে। খ্রীস্টধর্মের ক্রশ (Cross)

কেও একটী প্রতীক বলা যাইতে পারে। মানবের জন্য বাহ্য মূর্তি পূজার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহা ধর্মরাজ্যে প্রবেশের প্রধান সোপান স্বরূপ। মাত্র উচ্চস্তরের সাধকেরা মানস পূজা ও ধ্যানে রত থাকেন। বিগ্রহগুলিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া এবং নিজমধ্যে দেবতার কল্পনা করিয়া তবে সাধক পূজায় প্রবৃত্ত হয়। পূজার মন্ত্রাদি হইতেই এই সব বিষয় যে গভীর ভাবব্যঞ্জক তাহা জানা যায়। সুতরাং মূর্তিপূজা পৌত্তলিকতা বলিয়া উপহাস করা বাতুলতা মাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একটী সুন্দর কথা বলিয়াছিলেন। তাহার সার এই যে যাঁহারা মূর্তিপূজা করেন তাঁহারা চোখ্ বুজে অন্ততঃ কালী দুর্গা, কৃষ্ণপ্রমুখ কোন বিগ্রহ দর্শন করেন বা চিন্তা করেন, কিন্তু যাঁহারা মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী নন, তাঁহারা চোখ বুজে অন্ধকার দেখেন।

গীতাতে সাধনার চারিটী মার্গের কথা আছে—কর্মযোগ, ভক্তি-যোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ। রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ-মার্গের সাধনা সহজ নহে এবং সাধকও সেজন্য বিরল। মানবমাত্রেই কর্মরত, কিন্তু কর্মযোগী নহে। যখন এই কর্মযোগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় এবং তখন তাহাতে শুদ্ধাভক্তি বা শুদ্ধজ্ঞানের প্রকাশ হয়। সুতরাং ভক্তিমার্গই প্রশস্ত এবং পূজাদি ব্যাপার তাহারই বাহ্যা-নুষ্ঠান। এইসব বিষয়ের অধিক আলোচনা এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। আরও একটি কথা বলা যাইতে পারে—এই মূর্তিপূজা হইতেই ভারতের স্থাপত্য, নানা শিল্প ও চারুশিল্পের যে বিকাশ হইয়াছে তাহা বর্তমান সভ্য জগৎকে স্তম্ভিত ও আকৃষ্ট করিয়াছে।

মুদ্রণালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি নিবন্ধন গ্রন্থের ১ম খণ্ডও সম্পূর্ণ

ভাবে মুদ্রিত হইতে বিলম্ব হইবে। সেজন্য কয়েকজন বন্ধুর আগ্রহাতিশয্যে মাত্র ১২টী দেবদেবীর বিবরণী দিয়া ১ম খণ্ডের ১ম ভাগ এক্ষণে প্রকাশিত হইতেছে। অবশিষ্ট বিষয়গুলি যত শীঘ্র সম্ভব দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত হইবে এবং ইহা বর্দ্ধিত কলেবর হইবে।

এই গ্রন্থপ্রণয়নে শাস্ত্রগ্রন্থাদি ও অন্যান্য যে সব গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে, গ্রন্থ শেষে তাহাদের নাম প্রদত্ত হইবে। তবে বিশ্বকোষ, জীবনীকোষ, Elements of Hindu Iconography প্রমুখ গ্রন্থ হইতে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। এবং এইজন্য ইহাদের লেখক ও প্রকাশকদের নিকট ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। প্রত্যেক দেবদেবীর অন্ততঃ এক একটি করিয়া রঞ্জিত চিত্র প্রদানের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বর্তমান সংস্করণে তাহা সম্ভবপর হইল না। ভবিষ্যতে এই প্রকার চিত্র ও পরিশিষ্টের মধ্যে অন্যান্য বহু তথ্যাদি সংযোজিত করিবার ইচ্ছা আছে।

শ্রীভারতী পত্রিকায় এই সব দেবদেবী ও পর্বাদি সম্বন্ধে যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলি সামান্য পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিতাকারে প্রকাশিত হইতেছে। পূর্বে এইসব বিষয় শ্রীভারতীতে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্য এই ছিল যে পাঠকবর্গের যদি কোন বিরুদ্ধ সমালোচনা থাকে, তাহা গ্রন্থে আলোচিত হইবে এবং সেজন্য বিজ্ঞপ্তিও সম্পাদকীয়স্তম্ভে ছিল, কিন্তু এপর্যন্ত কোন বিরুদ্ধ সমালোচনা পাওয়া যায় নাই। বরং অনেকেই এই শ্রেণীর গ্রন্থের জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন।

বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ, দার্শনিক ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আদর্শ স্থানীয় মহামহো-

পাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ মহাশয় এই গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখিয়াছেন। সেজন্য তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে সুধীবর্গ ও পাঠকবর্গ যদি এই গ্রন্থের মধ্যে কোন ভুল প্রমাদ পান বা এই সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন বক্তব্য জানান তাহা ভবিষ্যতে পরিশিষ্টে আলোচিত হইবে। গ্রন্থশেষে শুদ্ধিপত্র সংযোজিত হইবে। আর একটী বিষয় বলা প্রয়োজন— এই গ্রন্থে যে সব শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত বিবরণী আছে তদ্ব্যতীত আরও বহু প্রমাণ বিভিন্নশাস্ত্রে আছে; যেমন জগন্নাথদেবের কথা রামায়ণেও আছে (উত্তরকাণ্ড ১০৮।২৯) কিন্তু তাহাদের উল্লেখ করা হয় নাই, কারণ বৈদিকশাস্ত্র হইতেই দেখান হইয়াছে জগন্নাথ-দেবের পূজা আরও পূর্ববর্তী যুগের। তদ্রূপ বিভিন্ন আগমে যে নানাপ্রকার দার্শনিক ব্যাখ্যা আছে বা ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আছে তাহাও বাহুল্যভয়ে প্রদত্ত হয় নাই।

ঝুলন-পূর্ণিমা, ১৩৫৪
ভারতী মহাবিদ্যালয়
১, গৌরলাহা স্ট্রীট্
কলিকাতা।

শ্রীসতীশ চন্দ্র শীল

শ্রীশ্রীগণেশ

আর্যদিগের যে সব প্রধান দেবগণ ভারতে ও বহির্ভারতে পূজিত হইয়া আসিতেছেন, গণেশ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

নামকরণ—গণানাম্ ঈশঃ=গণেশঃ, অর্থাৎ ইনি গণদিগের অধীশ্বর। গণ' শব্দের অর্থ প্রমথ বা শিবের সেবক। শিবের এই সব সেবকেরা যক্ষজাতীয়। গণেশের বহু নাম আছে। ইহার মধ্যে অনেক নামের ভিত্তি বিভিন্ন পৌরাণিক উপাখ্যানে। নামভেদে মূর্তিরও বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। তন্ত্রে ৫০টী নাম দৃষ্ট হয়। এই ৫০টীর আবার ৫০টী শক্তির নামও আছে। 'শারদা তিলক' তন্ত্রের রাঘবভট্টের টীকায় (১।১১৬) গণেশের এই ৫০টী নাম ও ৫০টী শক্তির যে উল্লেখ আছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

গণেশ ও	তাঁহার শক্তি	গণেশ ও	তাঁহার শক্তি
(১) বিঘ্নেশ	হ্রী	(৯) দ্বিমুদন্তক	কান্তি
(২) বিঘ্নরাজ	শ্রী	(১০) গজবক্ত্র	কামিনী
(৩) বিনায়ক	পুষ্টি	(১১) নিরঞ্জন	মোহিনী
(৪) শিবোত্তম	শান্তি	(১২) কপর্দী	নটী
(৫) বিঘ্নকৃৎ	স্বস্তি	(১৩) দীর্ঘজীহ্বক	পার্বতী
(৬) বিঘ্নহর্তা	সরস্বতী	(১৪) শঙ্কুকর্ণ	জ্বালিনা
(৭) গণ	স্বাহা	(১৫) বৃষভধ্বজ	নন্দা
(৮) একমুদন্তক	মেধা	(১৬) গণনায়ক	মুপাশা

গণেশ ও	তাঁহার শক্তি	গণেশ ও	তাঁহার শক্তি
(১৭) গজেন্দ্র	কামরূপিনী	(৩৪) বামদেব	দীর্ঘঘোণা
(১৮) সূর্যকর্ণ	উমা	(৩৫) বক্রতুণ্ড	ধনুর্ধরা
(১৯) ত্রিলোচনঃ	তেজোবতী	(৩৬) দ্বিরন্তক	যামিনী
(২০) লম্বোদর	সত্যা	(৩৭) সেনানীরমণ	রাত্রি
(২১) মহানন্দ	বিঘ্নেশানী	(৩৮) মত্ত	কামান্ধা
(২২) চতুর্মূর্তি	স্বরূপিনী	(৩৯) বিমত্ত	শশিপ্রভা
(২৩) সমাশিব	কামদা	(৪০) মত্তবাহন	লোলাক্ষী
(২৪) আমোদ	মদজিহ্বা	(৪১) জটী	চঞ্চলা
(২৫) দুর্মুখ	ভূতি	(৪২) মুণ্ডী	দীপ্তি
(২৬) সুমুখ	ভীতিকা	(৪৩) খড়গা	দুর্ভগা
(২৭) প্রমোদক	অসিতা	(৪৪) বরেণ্য	সুভগা
(২৮) একরদ	রমা	(৪৫) বৃষকেতন	শিবা
(২৯) দ্বিজিহ্ব	মহিষী	(৪৬) ভক্ষপ্রিয়	ভর্গা
(৩০) শূর	ভঞ্জিনী	(৪৭) গণেশ	ভগিনী
(৩১) বীর	বিকর্ণপা	(৪৮) মেঘনাদক	ভোগিনী
(৩২) সষণ্মুখ	ভ্রুকুটী	(৪৯) ব্যাপী	কালরাত্রি
(৩৩) বরদ	লজ্জা	(৫০) গণেশ্বর	কালিকা

পুরাণাদিতে কিন্তু গণেশ বা তাঁহার শক্তির এত নাম পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ এই ১২টী নাম প্রসিদ্ধ যথা (১) বক্রতুণ্ড (২) একদন্ত (৩) বিনায়ক (৪) গণপতি (৫) বিঘ্নেশ্বর (৬) অখু-রথ (৭) সিদ্ধিদাতা (৮) হেরম্ব (৯) দ্বি-দেহক (১০) লম্বোদর

১১) গজানন ও (১২) বালগণপতি। অগ্নিপুরাণে গণেশের শক্তির এই কয়টি নাম পাওয়া যায় যথা—জ্বালিনী, সূর্যেশা, কামরূপা, উদয়া, কামবর্তিনী, সত্যা, বিঘ্ননাশা ও গন্ধ মৃত্তিকা। তামিল ভাষায় আবার গণেশের নাম 'পিল্লৈয়র'। ভারতেতর দেশে গণেশের বহুমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে ঐ সব দেশেও গণেশ-পূজা প্রচলিত ছিল। তবে বিভিন্ন দেশে গণেশের বিভিন্ন নাম যথা—

তিব্বতে—ৎসা'গ্স্-ব্দগ, ও ব্গেগস্মেদ্প'ই ব্দগ্পো

বর্মাদেশে—মহা-পিত্রন্নে

মঙ্গলদেশে—তোৎখর্-ও উন্খঘন্

কম্বোজদেশে—প্রাহ্ কেনেস্

চীনদেশে—কু অন্-শি তি'এন্

জাপানে—শো-তেন্, বিনায়কৃশ, ক্ বন্জন্-শো ও কঙ্গি-তেন্।

ইতিহাস—ঋগ্বেদে (২।২৩।১) 'গণপতি' শব্দের প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু তাহা ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতির অন্যতম নাম। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১।২১) যে গণপতির উল্লেখ দেখা যায় তাহাও ব্রহ্মা, বনস্পতি বা বৃহস্পতির নামান্তর। তারপর তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।১।৫) 'দন্তী' নামক এক দেবতার মন্ত্র হইতে দেখা যায়, এই দেবতা পরবর্তী যুগের হস্তিমুণ্ডবিশিষ্ট গণেশ। এই মন্ত্রটী যথা—'তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্ নো দন্তীঃ প্রচোদয়াৎ"। ইহা হইতে দেখা যায় যে বৈদিক যুগেও গণেশ পূজিত হইয়াছেন।

তারপর পৌরাণিকযুগে রামায়ণ ও মহাভারতে যদিও হস্তিমুণ্ডবিশিষ্ট গণেশের উল্লেখ নাই, তাহা হইলেও শিব হইতে পৃথক একজন

দেবতার উল্লেখ আছে। ইহার নাম 'গণেশান'। পরবর্ত্তী পুরাণ সমূহে যেমন শিবপুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতিতে গণেশের বহু উল্লেখ আছে এবং উপাখ্যানও আছে। অগ্নিপুরাণে গণেশের গায়ত্রী আছে (৭১।১-৩); গণেশের পূজাপদ্ধতি আছে। গণেশের নামে একটি উপনিষৎ আছে। ইহার নাম 'গণেশাথর্বশীর্ষোপনিষৎ'; এবং একটী উপপুরাণ 'গণেশোপপুরাণ' আছে।

পৌরাণিক আখ্যান—মহাভারতে (১। ১ অঃ) দেখা যায় যে একদিন হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) ব্যাসদেবের নিকট আসিলে ব্যাসদেব তাঁহাকে একজন লিপিকারের অভাবের বিষয় জ্ঞাপন করেন। ব্রহ্মা গণেশকে এই কার্যে নিযুক্ত করিতে বলেন এবং পরে গণেশ স্বীকৃত হ'ন। ব্যাসদেব যোগবলে মহাভারতের শ্লোক রচনা করিতেন ও গণেশ তাহা লিখিয়া যাইতেন। তদবধি তিনি প্রসিদ্ধ লিপিকার ও সিদ্ধিদাতা নামে প্রসিদ্ধ। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রাচীনকালে ভারতীয় অক্ষরকে 'সিদ্ধম্' বলা হইত। সে জন্য লিখিবার প্রথমেই 'সিদ্ধি' শব্দ লিখিবার রীতি প্রচলিত। সুতরাং গণেশের সিদ্ধিদাতা নাম কার্যে সাফল্যদানকারী এবং প্রাচীন লিপির 'সিদ্ধম্' হইতে গৃহীত এই উভয়ই বুঝাইতে পারে।

দক্ষকন্যা সতী দেহত্যাগের পর হিমালয়-রাজার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন ও পরে মহাদেবের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পরে কোন পুত্রাদি না হওয়ায় পার্বতী বিষ্ণুর আরাধনা করেন ও তাঁহার বরে তিনি এক সুন্দর পুত্রলাভ করেন। স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতালে খুব উৎসব হইতে লাগিল। অনেক দেবতা কৈলাসে এই নবজাত পুত্র

দর্শনে আসিলেন। শনি দেবতাকে তাঁহার স্ত্রী এই অভিসম্পাত দিয়াছিলেন যে যাহার দিকে তিনি তাকাইবেন তাহারই মাথা উড়িয়া যাইবে। শনি এই ভয়ে প্রথমে কৈলাসে আসিতে চাহেন না। শিবের কথায় তিনি পরে আসিলেন। কিন্তু চোখ তুলিলেন না। পার্বতী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শনি সব কথা বলিলেন। পার্বতী ইহা হাস্যাস্পদ বলেন ও শনিকে নির্ভয়ে তাকাইতে বলেন। কিন্তু যেইমাত্র শনি চাহিলেন অমনি মাথা উড়িয়া গেল। পার্বতী কাঁদিয়া আকুল। বিষ্ণুকে ডাকিতে পাঠান হ'ল। বিষ্ণু আসিবার সময় রাস্তায় একটি হাতী শুইয়া থাকিতে দেখেন। ঐ হাতীর মাথাটী তিনি আনিয়া বালকের মাথায় দিয়া দিলেন। হস্তিমুণ্ড বলিয়া যাহাতে ভবিষ্যতে কেহ এই বালক দেবতাকে অনাদর না করে সেজন্য সকল দেবতা মিলিয়া এই বিধান করিলেন যে সর্বাগ্রে এই দেবতার পূজা না করিলে অন্যকোন দেবতার পূজাই সিদ্ধ হইবে না। স্কন্দ পুরাণে গণেশ খণ্ডে কিন্তু আবার এই আখ্যানটি অন্য রকমের। তাহাতে আছে যে সিন্দূর নামক একটী দৈত্য পার্বতীর গর্ভে অষ্টম মাসে প্রবেশ করিয়া গর্ভস্থ-সন্তানের মস্তক কাটিয়া ফেলে। পরে মস্তকহীন সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে নারদের অনুরোধে সেই সন্তানই গজাসুরের মাথা কাটিয়া মস্তকযুক্ত হইলেন। তদবধি ইঁহার নাম গজানন।

গজের দুইটি দন্ত। কিন্তু গণেশ কেন একদন্ত হইলেন তাহারও একটি পৌরাণিক আখ্যান আছে। যখন পরশুরাম ক্ষত্রিয়দিগকে নিধন করিয়া কৈলাসে হরপার্বতীকে প্রণাম করিতে আসেন তখন তাঁহারা নিদ্রিত ছিলেন। গণেশ পরশুরামকে অপেক্ষা করিতে বলেন। কিন্তু

পরশুরাম তাহা না শুনায় গণেশ দুই হাতে তাঁহাকে ত্রিভুবন ঘুরাইয়া দেন। পরশুরাম ইহাতে লজ্জিত হইয়া তাঁহার অমোঘ অস্ত্র পরশু নিক্ষেপ করেন। গণেশের তাহাতে একটী দাঁত ভাঙ্গিয়া যায় (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, গণেশ-খণ্ড)।

বৃহৎদন্তে গণেশ শত্রুকুলকে ধ্বংস করিলে তাহাদের রক্তে তিনি সিন্দুর বর্ণ হইয়াছিলেন। এই প্রকার অনেক আখ্যান আছে।

ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ কিন্তু এই প্রকার আখ্যানে সন্তুষ্ট বা বিশ্বাসবান নহেন। তাঁহারা গণেশের এবম্প্রকার মূর্তির কারণানুসন্ধানে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত করিয়াছেন। ফুশে, গেট প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে গণেশ প্রথমে দ্রবিড়জাতির দেবতা ছিলেন। ভারতের সূর্যোপাসক আদিম অধিবাসী-কর্তৃক তিনি পূজিত হইতেন। বাহন মূষিকের উপর উপবিষ্ট গণেশ সূর্যদেবতারই প্রতীকরূপে পূজিত হইতেন। আদিম জাতির দেবমূর্তিসমূহ অনেকস্থলে পশুমুণ্ডবিশিষ্ট। আর হস্তী ভারতের সর্ববৃহৎ জন্তু; সেজন্য প্রধান দেবতারূপে গণেশের হস্তিমুণ্ড কল্পিত হইয়াছে। মনুস্মৃতিতেও আছে যে ব্রাহ্মণদিগের দেবতা শিব ও শূদ্রদিগের দেবতা 'গণেশ'। এখানে শূদ্র শব্দের অর্থ ভারতের আদিম অধিবাসী। এবিষয়ে মনিয়র উইলিয়মস্ (M. Williams) কৃত Brahmanism and Hinduism গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। যাহা হউক এইসব তথ্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

পূজাপদ্ধতি—স্কন্দপুরাণমতে ভাদ্রমাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে গণেশ পার্বতীনন্দনরূপে কৈলাসে জন্মপরিগ্রহ করেন। কিন্তু অন্যমতে তিনি মাঘমাসের শুক্লাচতুর্থী তিথিতে আবির্ভূত হন। সেজন্য গণেশ-

পূজা ও ব্রতাদি সাধারণতঃ দাক্ষিণাত্য ও বোম্বাই প্রদেশে ভাদ্রমাসের ঐ তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়, আবার বাঙ্গালাদেশে মাঘমাসের এই চতুর্থী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। বোম্বাই প্রদেশে ও দাক্ষিণাত্যে এই পূজায় বিশেষ আড়ম্বর ও উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়, গৃহাদি আলোকমালায় সজ্জিত হয়; কিন্তু বাংলাদেশে বিশেষ আড়ম্বর লক্ষিত হয় না এবং অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই মূর্তি আনয়ন করিয়া পূজা করে। গণেশের দুই প্রকার ধ্যানমন্ত্র আছে—একটী পৌরাণিক যথা—

খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং
প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধ মধুপব্যালোল গণ্ডস্থলম্।
দন্তাঘাতবিদারিতরুধিরৈঃ সিন্দুরশোভাকরং
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কর্মসু”

আর একটি তান্ত্রিক মন্ত্র যথা—সিন্দুরাভং রাগম্……(তন্ত্রসার)। সাধারণতঃ পৌরাণিক মন্ত্রেই গণেশের পূজা হয়। গণেশের বীজমন্ত্র গৌঁ। গাং হৃদয়ায় নমঃ, গীং শিরসে স্বাহা এই প্রকারে অঙ্গন্যাস, করন্যাসাদি করিতে হয়। আর গণেশের পৌরাণিক মন্ত্র 'ওঁ গৌঁ নমো গণেশায়'। গণেশের গায়ত্রী যথা—

'একদংষ্ট্রায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি
তন্নো বিঘ্ন প্রচোদয়াৎ' (প্রাণতোষিণী দ্রষ্টব্য)।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণমতে—'ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁং গণেশ্বরায় ব্রহ্মরূপায় সর্বসিদ্ধিপ্রদেশায় বিঘ্নেশায় নমোনমঃ' মন্ত্রে গণেশ পূজা করিতে হয়। গণেশ পূজায় তুলসীপত্র প্রদান নিষিদ্ধ। প্রত্যেক পূজার প্রথমেই গণেশ-পূজা বিধেয়। গণেশের প্রণাম মন্ত্র—

দেবেন্দ্র মৌলিমন্দারমকরন্দকণারুণা ।
বিঘ্নান্ হরন্তু হেরম্ব চরণাম্বুজরেণবঃ ॥

গণেশের পত্নী—বুদ্ধি ও সিদ্ধি, এবং তাঁহার শক্তি লক্ষ্মী (এই লক্ষ্মী নারায়ণপত্নী নহে) ! গণেশ মুদ্রা—বিতর্ক, তর্জনী। প্রতীক—ভগ্ন হস্তিদন্ত, মোদক, বর্তসের সম্পুটক, জলপাত্র, আকাশবল্লী, বিগোর ফল, খড়গ, অক্ষমালা, হস্তিতাড়ণের অঙ্কুশ, ডালিম ফল, লোহিতাভা,জম্বুফল ইত্যাদি। গণেশের বর্ণ—লোহিত, পীতলোহিত, পীত, শ্বেত। ইঁহার বাহন মূষিক. অনেক স্থলে সিংহ।

মূর্তিপরিচয়—গণেশের বহুপ্রকার মুর্তি বিভিন্ন নামে ভারতে ও অন্যান্য দেশে আছে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ঢুন্টিরাজ ও বক্রতুণ্ড এই নামে গণেশের মুর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটী প্রধান গণেশমুর্তির পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে—

(ক) মহাগণপতি—মুদ্গলপুরাণে মহাগণপতির যে ধ্যান আছে তাহাতে দেখা যায়—ইঁহার ত্রিনেত্র, ললাটে চন্দ্রকলা, দশহাত ও তাহাতে বিভিন্ন প্রহরণ, অঙ্কে ইঁহার পত্নী আসীনা। মাদুরায় ও তিনেভেলি জেলায় বিশ্বনাথ মন্দিরে মহাগণপতির মূর্তি আছে। লক্ষ্মীগণপতি—যে মুর্তিতে মহাগণপতির সঙ্গে তাঁহার দুই দেবী থাকেন তাহার নাম লক্ষ্মীগণপতি। (গ) বালগণপতি—ইঁহার মুর্তি বালকবৎ; চারহাতে আম্র, কলা, কাঁঠাল, ও ইক্ষু এই ফলগুলি আছে। এই প্রকারে (ঘ) ভক্তি বিঘ্নেশ্বর (ঙ) বীর বিঘ্নেশ (চ) শক্তি গণেশ (ছ) উচ্ছিষ্ট গণপতি (জ) উর্ধগণপতি (ঝ) পিঙ্গলগণপতি (ঞ) হেরম্ব (ট) প্রসন্নগণপতি (ঠ) ধ্বজগণপতি (ড) উন্মত্ত

উচ্ছিষ্ট গণপতি (ঢ) বিঘ্নরাজ গণপতি (ণ) ভুবনেশ গণপতি
(ত) নৃত্ত-গণপতি (থ) হরিদ্রাগণপতি বা রাত্রি-গণপতি (দ) ভালচন্দ্র
(ধ) সূরপকর্ণ (ন) একদন্ত, ইত্যাদি আছে। ইঁহাদের মূর্তিতে
কাহারও দশহাত, কাহারও আটহাত, কাহারও চারহাত এবং অন্যান্য
বৈষম্যও আছে। এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ ও মূর্তি পরিচয় গোপী-
নাথরাও-কৃত Elements of Hindu Iconography Vol. I. pt. I.
গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

মন্দিরাদি—বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত পুণানগরের নিকটে
একটী পাহাড় আছে; ইহার মধ্যে প্রায় ২৪টী গুহামন্দির আছে,
এই সব মন্দিরে বহু দেবদেবীর মূর্তি আছে। সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম
গুহার ভিতরে (তাহার নাম গণেশলেনা) গণেশের মন্দির আছে।
উড়িষ্যার উদয়গিরি পাহাড়েও একটী গণেশ গুহা আছে। নর্মদা
নদীর তীরে একটী কুণ্ড আছে উহার নাম গণেশ কুণ্ড। রাজ-
গীরের মধ্যেও একটী পবিত্র উষ্ণ প্রস্রবণ গণেশকুণ্ড নামে খ্যাত।

ভারতের বহুস্থানে গণেশমন্দির আছে ও পূর্বোল্লিখিত বিভিন্ন
প্রকারের গণেশ বিভিন্ন মন্দিরে আছে। বোম্বাই ও দক্ষিণ ভারতেই
এই সব মন্দিরের প্রাচুর্য লক্ষিত হয়। এই সব মন্দিরের বিস্তারিত
বিবরণ এই গ্রন্থে সম্ভবপর নহে।

তত্ত্ব—'গণপতি তত্ত্ব' নামক গ্রন্থে গণেশকেই পরব্রহ্ম বলিয়া
বর্ণনা করা হইয়াছে এবং প্রমাণস্বরূপ ইহাতে একটী শ্রুতির
বচন ও অন্যান্য বহুপ্রমাণ উদ্ধৃত আছে। এই প্রকার মতবাদীদিগকে
গাণপত্য সম্প্রদায় বলা হয়। ইঁহারা আবার ৬টী দলে বিভিক্ত।

এক একদল এক এক প্রকার গণপতির পূজা করেন—যথা, মহাগণপতি, হরিদ্রাগণপতি, উচ্ছিষ্টগণপতি, হেরম্বগণপতি, স্বর্ণগণপতি ও সন্তান-গণপতি। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের গণেশ-অধ্যায়ে দেখা যায় যে বিষ্ণু গণেশের ৮টী নামকরণ করিয়াছেন এবং এই আটটী নামের আট প্রকার আধ্যাত্মিক তত্ত্বমুলক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—(১) গণেশ; গ=জ্ঞান, ণ=মুক্তি। 'গণেশ' অর্থ যিনি জ্ঞান ও মুক্তিদান করেন। (২) একদন্ত, এক=প্রধান; দন্ত=বল অর্থাৎ যিনি প্রধান বলসম্পন্ন। (৩) হেরম্ব; হে=দীন, রম্ব=পালক অর্থাৎ যিনি দীনপালক (৪) লম্বোদর অর্থাৎ পূর্বে বিষ্ণু প্রদত্ত নৈবেদ্য ও পিতৃদত্ত ভোগে যাঁহার উদর লম্বমান ইত্যাদি। গণেশকে এইরূপে পরব্রহ্ম কল্পনা করিয়া তাঁহার অনেক অবতারের কথাও—যেমন বক্রতুণ্ড, কপিল, চিন্তামণি, বিনায়ক ইত্যাদি—স্কন্দপুরাণের গণেশখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

উপসংহার—ইহাই সংক্ষেপে সর্বসিদ্ধি প্রদাতা, সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধায়ক, বিঘ্নবিনাশক গণদেবের সংক্ষিপ্ত কথা। [গণেশ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ, ও কি প্রকারে ও পদ্ধতিতে গণেশের পূজা তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি সুদূর দেশে প্রচারিত হইল তৎসম্বন্ধে স্বর্গগত পণ্ডিত অমূল্য-চরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় একটি পুস্তক রচনা করিতেছিলেন। উহার কতকাংশ শ্রীভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছে। উহার অবশিষ্টাংশ আমরা সংগ্রহ করিতেছি এবং শীঘ্রই শ্রীভারতী গ্রন্থমালায় পৃথকভাবে প্রকাশিত হইবে।]

শ্রীশ্রীসরস্বতী

নদী—সরস্বতী শব্দের আদি অর্থ নদী (সরস্ শব্দের অর্থ নীর বা জল)। মনুসংহিতার মতে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুইটি দেবনদী এবং এই নদীদ্বয়ের মধ্যস্থিত ভূভাগের নাম ব্রহ্মাবর্ত (উত্তর ভারত)। ভারতবর্ষে ৭টী নদী পুণ্যতোয়া এবং যে কোন পূজাকার্যে এই ৭টী নদীর নাম আহ্বান করিতে হয় যথা—গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী। সরস্বতী নদী আবার দেশভেদে ৭টী বিভিন্ন নামে পরিচিতা, যথা—পুষ্করতীর্থে পিতামহ ব্রহ্মার যজ্ঞে আহূতা হইয়া 'সুপ্রভা' নামে পরিচিতা, নৈমিষারণ্যে যাজ্ঞিক ঋষিগণ কর্তৃক আহূতা হইয়া 'কাঞ্চনাক্ষী' নামে অভিহিতা, গয়াদেশে গয়রাজ কর্তৃক যজ্ঞে আহূতা হইয়া 'বিশালা' নামে, উত্তর কোশলে ঔদ্দালক মুনির অনুষ্ঠিত যজ্ঞে আহূতা হইয়া 'মনোরমা', কুরুক্ষেত্রে কুরুরাজ যজ্ঞে 'ওঘবতী', হরিদ্বারে দক্ষপ্রজাপতি যজ্ঞে 'সুরেণু' ও হিমালয় পর্বতে ব্রহ্মার যজ্ঞে 'বিমলোদা' নামে অভিহিতা। মহাভারতের অন্তর্গত শল্যপর্ব (৫৪ অ.) ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ড (৬ষ্ঠ অঃ) প্রভৃতি হইতে দেখা যায় যে—সমস্ত নদীর মধ্যে এই নদী পুণ্যতমা এবং যে কোন ব্যক্তি এই নদীতে স্নান করিলে তাঁহার সমস্ত পাপ বিধৌত হইয়া যায়। কেন এই নদীর এত মাহাত্ম্য এবং কেন ইহা আর্য জাতির এত প্রিয় তাহা বৈদিক সাহিত্যালোচনা করিলে জানা যায়। বৈদিক যুগের আর্যগণ যখন উত্তর-পশ্চিম ভারত

হইতে ক্রমে আর্যাবর্তের বিভিন্নস্থানে বসতি স্থাপন করিতে লাগিলেন তখন তাঁহারা এই স্বচ্ছসলিলা নদীকুল নির্বাচন করিয়া লইলেন। এই নদীতটের উর্বরভূমি তাঁহাদিগকে অন্নদান করিত এবং কৃষিকার্যে বিশেষ সহায়ক হওয়ায় এই নদীই তাঁহাদের জীবনরক্ষার উপায় ছিল। এইজন্যই ঋগ্বেদে (২।৪১।১৬-১৮) সরস্বতীকে অন্নবতী, উদকবতী ও দ্যুতিমতী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডল হইতে ১০ম মণ্ডল পর্যন্ত বহুস্থানে এই সরস্বতী নদীর স্তুতি আছে। যে সব স্থান দিয়া এই নদী প্রবাহিতা হইয়াছে সেখানে বহুতীর্থের উদ্ভব হইয়াছে। এই নদীই পারসীকদিগের 'আবেস্তা' ধর্মগ্রন্থে 'হরকুইতি' নামে প্রসিদ্ধ। দেবী সরস্বতী কিভাবে সরস্বতী-নদীতে পরিণতা হইলেন তাহার একটী পৌরাণিক আখ্যান আমরা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে দেখিতে পাই। লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা এই তিন দেবী বিষ্ণুর প্রিয়া ছিলেন এবং ইঁহারা সর্বদা বিষ্ণুর নিকট অবস্থান করিতেন। একদিন সরস্বতী বিষ্ণুকে গঙ্গার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত দেখিয়া বিষ্ণুকে তিরস্কার করেন। গঙ্গা ইহাতে কুপিতা হইয়া সরস্বতীকে শাপ দেন যে তিনি নদীরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইবেন। সরস্বতীও গঙ্গাকে এইভাবে অভিসম্পাৎ করেন। তদবধি উভয়েই নদীরূপে প্রবাহিতা হইতেছেন।

বৈদিক সরস্বতী নদী কোন্‌টী? ভারতে আমরা ৩টী সরস্বতী নদীর পরিচয় পাই—(১) একটি পাঞ্জাবের সিরমুর রাজ্যের পর্বত হইতে বাহির হইয়া আম্বলা, কুরুক্ষেত্র, পাতিয়াল প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া সিরসা জেলার দৃষদ্বতী (ইহার অন্যনাম কাগার) নদীতে মিলিত হইয়া রাজ-

পুতনার বহুস্থান অতিক্রম করিয়া প্রয়াগে গঙ্গা ও যমুনার সহিত মিলিত হয়। ইহাই বেদের সরস্বতী। ইহার সহিত সিন্ধুনদেরও সংযোগ ছিল এবং ঋগ্বেদ্ আলোচনায় দেখা যায় ইহা মধ্য এসিয়া হইতে উদ্ভূত (সরস্বতী সিন্ধুভি পিন্বমানা—ঋ. ৬।৫।২৬)। সুতরাং এই নদীর আদি উৎপত্তি স্থল সিরমুর রাজ্য অতিক্রম করিয়া আরও উত্তরে। এই বিশাল নদী বর্তমানে ক্ষীণ কলেবরা ও রাজপুতনার মরুভূমি মধ্যে অন্তর্হিতা।

(২) রাজপুতনার আবু পাহাড় হইতে বাহির হইয়া পালনপুর প্রভৃতি রাজ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত নদীর সহিত এই নদী এক সময়ে সংযুক্ত থাকায় ইহারও নাম সরস্বতী। (৩) বাংলায় হুগলী জেলার ত্রিবেণীর নিকট হইতে সরস্বতী বহির্গত হইয়া হাওড়ার আন্দুল প্রভৃতির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। একসময়ে ইহাও বিশালকায়া ছিল এবং ইহাতে বাণিজ্যপোত যাতায়াত করিত এবং খ্রীস্টায় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এই নদীতটস্থ সপ্তগ্রাম একটি বন্দর ছিল। প্রয়াগে গঙ্গা ও যমুনার (এবং একসময়ে সরস্বতীর) সঙ্গম-স্থলকে যুক্ত ত্রিবেণী বলা হয় এবং গঙ্গারই ২টি ধারা এই হুগলীর ত্রিবেণীর নিকট হইতে বহির্গত হওয়ায় ইহাকে মুক্ত ত্রিবেণী বলা হয় এবং এই দুইটি ধারার নাম দেওয়া হয় যমুনা ও সরস্বতী। সুতরাং প্রথমোক্ত সরস্বতী নদীই আর্যদিগের বৈদিক যুগের সরস্বতী।

এই সরস্বতী সম্বন্ধে বহুতথ্য পাওয়া যায় বাজসনেয় সংহিতা (১৯।৯৩), তৈত্তিরীয় সংহিতা (১।৮।১৩।৩), অথর্ববেদ (৪।৪।৬) এবং ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে।

যাহা হউক বৈদিক সাহিত্যের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে আর্যরা প্রথমে প্রকৃতির মধ্যে বিশ্ব-নিয়ন্তাকে অনুভব করেন, তারপর প্রকৃতির প্রত্যেক বিকাশে তাঁহারা এক একটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পরিকল্পনা করেন।

এইভাবে সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, নদ, নদী প্রতি বস্তুরই অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবী স্তুত হইতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমশঃ সরস্বতী নদী হইতে ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর পরিকল্পনা হয়।

সংজ্ঞা—দেবা সরস্বতীর অন্যান্য অনেক নাম আছে যথা—শ্রী, ভারতী, বাগ্‌দেবী, ব্রাহ্মী, ভাষা, গির, বাচ্‌, বাণী, ইড়া, সারদা, গিরা, গিরাংদেবী, গীর্দেবী ঈশ্বরা, বাচা, বচসামীশ, বর্ণমাতৃকা, গো, বাক্যেশ্বরী, সায়ংসন্ধ্যা দেবতা, সন্ধ্যেশ্বরী (কবিকল্পলতা)।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে এই দেবীর উৎপত্তি বিষয় এইভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—সৃষ্টিকালে পরমপুরুষের ইচ্ছানুসারে তাঁহার শক্তি পাঁচভাগে বিভক্ত হ'ন যথা—রাধা, পদ্মা, সাবিত্রী, দুর্গা ও সরস্বতী। ইঁহাদের মধ্যে সরস্বতী শাস্ত্রজ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইনি শুক্লবর্ণা, বীণাপাণি, ও কোটি চন্দ্রের ন্যায় শোভাধারিণী। ইনি শুদ্ধ সত্ত্ব-স্বরূপা।

দেবীভাগবত মতে সরস্বতী ব্রহ্মার স্ত্রী, কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণানুযায়ী লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েই নারায়ণের স্ত্রী বলিয়া কথিতা। আবার কোন কোন পুরাণে আছে সরস্বতী ব্রহ্মার মানস কন্যা। মূল কথা এই যে পরমপুরুষ তিন প্রকার মূর্তিতে বিশ্বজগৎ পরিপালন করিতেছেন, ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে স্থিতি ও মহেশ্বররূপে সংহার

কার্য করিতেছেন। আর তিনি কার্যের ৩টী বিভিন্নাশক্তি—মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী ও মহাকালী।

পূজাপ্রচলন—শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে এই দেবীকে পূজা করেন। এই দেবী শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নারায়ণকে ভজনা করিতে বলেন। আরও বললেন, "মাঘমাসের শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে ও বিদ্যারম্ভকালে সকলে তোমার পূজা করিবে। তুমি প্রসন্ন না হইলে কেহই বিদ্যালাভে সমর্থ হইবে না।" তদবধি মাঘের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই দেবীর পূজা হইতে থাকে। অতি প্রাচীনকালেও সরস্বতী পূজার বিধি ছিল; কিন্তু তাহা এই তিথিতে নহে। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে যে পূর্বকালে পূর্ণিমা তিথিতে সরস্বতীর নিকট অঞ্জলি দেওয়া হইত। কৃষ্ণযজুর্বেদ বলেন নবমী তিথিতে সরস্বতীকে উৎসর্গ করা বিধেয়। যাহা হউক বর্তমানে মাঘী শুক্লা-পঞ্চমী তিথিতেই সরস্বতী-পূজার বিধি প্রচলিত। ঐ দিনকে 'শ্রীপঞ্চমী' বলা হয় এবং লক্ষ্মী পূজারও ব্যবস্থা এই সঙ্গে আছে। ঐ সময় হইতে সাধারণতঃ বসন্ত ঋতু আরম্ভ হয় বলিয়া ইহার অন্য নাম 'বসন্ত পঞ্চমী'। বঙ্গদেশের বাহিরে কোন কোন স্থানে আশ্বিন মাসের শুক্লা-অষ্টমী তিথিতে সরস্বতী পূজা হয়।

মূর্তিপরিচয়—ভারতে ও বহির্ভারতে বিভিন্ন প্রকার সরস্বতী মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ঐগুলিকে ৪ শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে—(ক) একক আসীনা (খ) একক দণ্ডায়মানা (গ) ব্রহ্মার পরিবার দেবতারূপে দণ্ডায়মানা (ঘ) বিষ্ণুর পরিবার দেবতারূপে দণ্ডায়মানা। সাধারণতঃ সরস্বতী পদ্মাসীনা। বিষ্ণুধর্মোত্তরের মতে সরস্বতী

শ্বেতপদ্মের উপর দণ্ডায়মানা থাকিবেন। হংসবাহনা সরস্বতীই দেখা যায়, কিন্তু কোন কোন স্থানে ময়ূরবাহনা সরস্বতী মূর্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বোম্বাই প্রদেশের সরস্বতী ময়ূরবাহনা। রাজপুতনাতেও ২।১টি এই প্রকার মূর্তি পাওয়া যায়। কানিংহাম সাহেবের মতে গঙ্গায় মকর, যমুনায় কচ্ছপ ও সরস্বতীতীরে ময়ূরের প্রাচুর্য থাকায় এই সব দেবী মূর্তির বাহন যথাক্রমে মকর, কচ্ছপ ও ময়ূর। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার প্রত্নতত্ত্বশালায় (৩৯৪৭ সংখ্যক মূর্তি) একটি সিংহবাহনা সরস্বতীও দেখিতে পাওয়া যায়। মেষবাহনা সরস্বতী মূর্তিও পাওয়া যায়। রাজসাহী বারেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতিতে এইপ্রকার একটি মূর্তি আছে। সাধারণতঃ সরস্বতী মূর্তি দুই হস্তবিশিষ্ট। তাঁহার এক হাতে পুস্তক, অপর হাতে মালা বা বীণা। কোন কোন স্থানে ৪ হস্ত বিশিষ্ট সরস্বতী মূর্তিও আছে—তাঁহার হাতে পাশ ও অঙ্কুশ এবং বীণা ও কমণ্ডলু থাকে।

বৌদ্ধশাস্ত্রেও দেবী সরস্বতী বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পূজিতা হইতেন। ক্রমে বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাব নেপালে, তিব্বত হইতে সুদূর চীন, যবদ্বীপ, জাপান প্রভৃতি দেশে বিস্তার লাভ করিল আর সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতীর মাহাত্ম্যও দেশদেশান্তরে বিস্তৃত হইল। বৌদ্ধতন্ত্রে বিদ্যার অধিপতি দেবতার নাম মঞ্জুশ্রী। ইঁহার স্থান বোধিসত্ত্বের নীচে। একখানি মঞ্জুশ্রী চরিতে দেখা যায় যে লক্ষ্মী, সরস্বতী উভয়েই মঞ্জুশ্রীর শক্তি (মঞ্জুশ্রীবিক্রীড়িত—৩১৩ খ্রীঃ অব্দে চীনাভাষায় ইহার অনুবাদ হয়)। বৌদ্ধতান্ত্রিকেরা ক্রমে বাগীশ্বর মঞ্জুশ্রীর শক্তি—বাগীশ্বরী দেবী সরস্বতীর ভক্ত হইলেন। বাগীশ্বরীর দুই প্রকার ভেদ—ধেনু-

বাগীশ্বরী ও সৌভাগ্য বাগীশ্বরী। হিন্দু-তান্ত্রিকমতে ধেনুবাগীশ্বর শব্দব্রহ্ম (যাহা দার্শনিক ভাষায় Logos)। যাহা হউক বৌদ্ধশাস্ত্রে চারি প্রকার সরস্বতীর পরিচয় পাওয়া যায়—(১) মহাসরস্বতী (২) বজ্রবীণা সরস্বতী (৩) বজ্রসারদা (৪) আর্য সরস্বতী। মহাসরস্বতীর চারিপার্শ্বে ৪টি নায়িকা—সম্মুখে প্রজ্ঞা, পশ্চাতে মতি, দক্ষিণে মেধা, বামে স্মৃতি। তিনি চন্দ্রমণ্ডলে অবস্থিতা। (তাঁহার ধ্যান সাধনমালা, সংখ্যা ১৬২ পৃঃ ৩২৯ দেখুন)। বজ্রবীণা সরস্বতীর দুই হাতে দুই বীণা। বজ্রসারদার দক্ষিণ হস্তে পদ্ম, অপর হস্তে পুস্তক। আর্য সরস্বতীর দক্ষিণ হস্তে রক্ত পদ্ম, বাম হস্তে প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক।

বৌদ্ধতন্ত্রানুযায়ী হিন্দুতন্ত্রেও সরস্বতীর বিভিন্ন ধ্যান ও রূপ-কল্পনা দেখা যায়—যেমন নীলসরস্বতী প্রভৃতি।

জৈনদের মধ্যেও দেবী সরস্বতী বিভিন্নরূপে পূজিতা হ'ন। দেবী জৈনশাস্ত্রে 'শ্রুতদেবী' বলিয়াই পরিচিতা। ভগবানের মুখ-নিঃসৃত বাণীই শ্রুত এবং সরস্বতী তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। অনেক জৈনগ্রন্থে, [যেমন জ্ঞাতা ধর্মকথাসূত্র, (১ শ্রুঃ ৪ বর্গ ১ অঃ)] বর্ধমানাদি তীর্থঙ্করের সহিত সরস্বতীর প্রণাম আছে। শ্রবণবেলগোলায় জৈন-নির্মিত একটী অষ্টধাতুর "শ্রুতস্কন্ধযন্ত্র" বা "সরস্বতী-যন্ত্র" আবিষ্কৃত হইয়াছে। যাহা হউক অতি প্রাচীন কাল হইতেই শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় জৈন সম্প্রদায়ই সরস্বতীকে গীর্বাণী বাগ্‌দেবতারূপে পূজা করিয়া আসিতেছেন। ২৪ জন তীর্থঙ্করের যে ২৪ জন শাসনদেবী আছেন, তাঁহাদের মধ্যে ১৬ জন শাসনদেবী বিদ্যাদেবীরূপে পূজিতা। এই ১৬ জন বিদ্যাদেবী যথা—রোহিনী, প্রজ্ঞপ্তী, বজ্রশৃঙ্খলা,

কুলিশাঙ্কুশা, চক্রেশ্বরী, নরদত্তা, কালী, মহাকালী, গৌরী, গান্ধারী, জ্বালা, মানবী, বৈরোট্যা, অচ্ছুপ্তা, মানসী ও মহামানসী। যাহা হউক, ভারতীয় বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় দেবী সরস্বতীর পূজা প্রত্যেক শাস্ত্রেই বিহিত আছে। তবে তাঁহার মূর্তি-কল্পনায় কিছু তারতম্য আছে। ঋগ্বেদের বহু মন্ত্রের দেবতা সরস্বতী। ঋগ্বেদের ১০টী মন্ত্র লইয়া একটী উপনিষদ্ সংকলিত হইয়াছে—ইহার নাম "সরস্বতীরহস্যোপনিষৎ"। বর্তমানে যেমন নারায়ণ, কৃষ্ণ প্রভৃতির মন্দিরের প্রাচুর্য ভারতের সর্বত্র রহিয়াছে, সরস্বতী-মন্দিরের তদ্রূপ প্রাচুর্য না থাকিলেও বহু প্রাচীন কয়েকটী সরস্বতী মন্দির আছে—যেমন কাশ্মীরের সারদাদেবীর মন্দির ইত্যাদি। শুধু ভারতে নহে, সুদূর প্রাচ্যের অনেক স্থানেও সরস্বতী-মন্দির এখনও বর্তমান। জাপানেরও কয়েক স্থানে সরস্বতী মন্দির আছে। জাপানে ৭টী সৌভাগ্যদেবতা আছেন। তাঁহাদের মধ্যে ৩টী দেবতার পূজা ভারত হইতে গৃহীত, যথা—(ক) 'দই-কোকুতেন' বা মহাকাল (খ) 'বেন-জই-তেন' বা সরস্বতী (গ) 'বিষমনতেন' অর্থাৎ বৈশ্রবণ বা কুবের। জাপানের যে সব সরস্বতীমন্দির আছে তাহা সাধারণতঃ পুষ্করিণী বা জলাশয়ের তীরে। যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে বর্তমানে যে সব সরস্বতীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা এক সময় যে এইসব স্থানে দেবীর যথাযথভাবে পূজা হইত তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে।

দেবী সরস্বতী শুধু মূর্তিরূপে দেশবিদেশে পূজিতা হ'ন না, বিদ্যার প্রতীক গ্রন্থাদিতেও তিনি পূজিতা হ'ন। আর তন্ত্রশাস্ত্রের [illegible] দেখা যায়—'বাগীশ্বরী' যন্ত্ররূপেও তিনি পূজিতা

হ'ন। ভারতের দ্বিজগণের যে ত্রিসন্ধ্যাপাঠবিধি আছে, তাহার মধ্যে সায়ংসন্ধ্যার অধিষ্ঠাত্রীরূপে দেবী সরস্বতী প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ দ্বিজগণ কর্তৃক স্তুত হইতেছেন।

প্রাচীন গ্রীসে এই দেবী "Athena" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। রোমকেরা ইঁহাকে 'Minerva' বলিতেন। ইনি এখানে Zeus বা ইন্দ্রের কন্যা এবং অনূঢ়া। অপিচ, ইহার উৎপত্তির উপাখ্যান এদেশের উপাখ্যানের অনুরূপ। এই দেবী Ulyssesএর ইষ্টদেবী ছিলেন। প্রাচীন Athensএ ইঁহার একটী উৎসব প্রতি চারি বৎসর অন্তর অনুষ্ঠিত হইত। ইহা 'Panathenaea' নামে অভিহিত হইত।

পূজাবিধি— সরস্বতী পূজা দুই প্রকারের হয়—এক মৃন্ময়ী মূর্তিতে আর এক বিদ্যালাভের যে সব উপকরণ যেমন বই, দোয়াত, কলম, কাগজ ইত্যাদির পূজা দ্বারা। সরস্বতী নিজে শ্বেতবর্ণ, শুভ্র-বসনা, এবং শুভ্রবীণাযুক্ত। সেজন্য তাঁহার পূজার উপকরণও শ্বেতবর্ণ—সাদা ফুল, সাদা ধান, সাদা চন্দন, মাখন, দুধ, দৈ, ইত্যাদি। ইহার সঙ্গে আম্রমুকুল ও অভ্রও দেওয়া হয়। পশ্চিমে ঐদিন প্রথম হোলিগান হয় সেজন্য বোধ হয় এই পূজায় আবীর ও অভ্র দেওয়া হয়। এই পূজার প্রথমে লক্ষ্মীপূজা করিতে হয়, তারপর সংকল্পবাক্য পাঠ করিয়া অন্যান্য পূজার ন্যায় পূজা করিতে হয়। পূজার শেষে সরস্বতীর ৮টী অঙ্গ—লক্ষ্মী, মেধা, ধরা, পুষ্টি, গৌরী, তুষ্টি, প্রজ্ঞা ও ধৃতি—এই সকলের পূজা করিতে হয়।

সরস্বতীর বীজমন্ত্র ঐঁ। "ওঁ ঐ নমো সরস্বত্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়। ইঁহার ধ্যানমন্ত্র এইরূপ—

"ওঁ তরুণসকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ
কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিসন্না সিতাব্জে।
নিজকরকমলোদ্যল্লেখনী পুস্তকশ্রীঃ
সকলবিভবসিদ্ধৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ।"

ইঁহার প্রণাম মন্ত্র এই প্রকার—

"ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমঃ নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ
বেদবেদাঙ্গবেদান্ত বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ স্বাহা।"

তন্ত্রে সরস্বতীপূজার বিভিন্ন মন্ত্রাদি আছে ও পূজাবিধিরও সামান্য পার্থক্য আছে। সরস্বতীর মন্ত্র, কবচ প্রভৃতিও আছে। তারাদেবী তন্ত্রে নীলসরস্বতী নামে বিখ্যাতা। তন্ত্রসারে পারিজাতসরস্বতী নামে একটী পৃথক প্রকরণ আছে। 'সরস্বতীতন্ত্র' নামে একটী পৃথক তন্ত্রের গ্রন্থও আছে।

তত্ত্ব—এই দেবী সরস্বতীই সৃষ্টির প্রধানা শক্তি। সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র পরমপুরুষ ব্রহ্মাই ছিলেন—'প্রজাপতি বৈ ইদমাসীৎ'। আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন মাত্র বাক্—'তস্য বাক্ দ্বিতীয়া আসীৎ'। আর এই বাক্ হইতেই তিনি জগৎ সৃষ্টি করিলেন—'বাগেবাস্য সা সৃজ্যত'। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও (১।২।৫) আছে—বাক্ ও আত্মাদ্বারা চারিবেদ এবং বিশ্বচরাচর সৃষ্ট হইল। সুতরাং দেখা যাইতেছে সৃষ্টির আদি কারণ ও শক্তি বাক্, আর বাক্ ও ব্রহ্ম এক—বাগ্‌বৈ ব্রহ্ম (বৃহ. উ. ৪।১।২)। এই বাক্ই দেবী সরস্বতী এবং সৃষ্টির আদিশক্তি।

সংক্ষেপে দেবী সরস্বতী সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল। কোন্ প্রাচীন কাল হইতে আজও আর্যধর্মাবলম্বীদের গৃহে গৃহে দেবী

পূজিতা হইতেছেন। ভক্তগণ শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গান গাহিয়া বিশিষ্ট দিবসে (মাঘী শুক্লা ৫মী) জননীর আগমনবার্তা জগৎবাসীকে জানাইয়া থাকেন।

দেবীর কৃপায় দেশবাসীদের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়া জগৎ জ্ঞানের শুভ্র আলোকে উজ্জ্বল হউক—ইহাই তাঁহার নিকট প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মী

পৌরাণিক কাহিনী—বিভিন্ন পুরাণে লক্ষ্মীদেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে কয়েকপ্রকার কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। তবে মূলতঃ এই কয়টী বিষয় এক, যথা—

তিনি নারায়ণ-(বা বিষ্ণু-) পত্নী এবং বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন। তিনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা এবং সর্বপ্রকার সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও সর্বসৌভাগ্যদায়িনী।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আছে যে এক সময়ে নারদ নারায়ণকে লক্ষ্মীদেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে নারায়ণ বলেন—

সৃষ্টির প্রাক্‌কালে রাসমণ্ডলস্থিত শ্রীকৃষ্ণের বামভাগ হইতে লক্ষ্মীদেবী উৎপন্না হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল কোটি শারদীয়া পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রভাযুক্ত ও পদ্মসদৃশ। উৎপন্ন হইয়াই তিনি দ্বিধা বিভক্ত হইলেন—এই দুই দেবী রাধিকা ও লক্ষ্মী। রাধিকা প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে প্রার্থনা করেন ও পরে লক্ষ্মীও তাঁহাকে প্রার্থনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের প্রার্থনাই পূর্ণ করিলেন। তিনি দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণমূর্তিতে রাধিকাকে গ্রহণ করিলেন ও চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তিতে লক্ষ্মীকে গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা ও গোপগোপীসহ গোলকে ও নারায়ণ লক্ষ্মীসহ বৈকুণ্ঠে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এই লক্ষ্মীদেবী স্বর্গে ইন্দ্রের সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বর্গলক্ষ্মী-

রূপে—মর্ত্ত্যে রাজলক্ষ্মী, ও গৃহলক্ষ্মীরূপে ও জাগতিক সর্বপ্রকার সুখ, ঐশ্বর্য, শোভা বা শ্রীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বিরাজ করেন। এইরূপে তিনি স্নিগ্ধ শ্রীমণ্ডিত মূর্তিতে বিশ্বচরাচর রক্ষা করেন বলিয়া দেবীগণের মধ্যে মহতী—তিনি মহালক্ষ্মীরূপে খ্যাতা। আর যেখানে তিনি অধিষ্ঠান করেন না তাহা হতশ্রী ও শোভাহীন। তিনি বৈকুণ্ঠে পূর্ণরূপে ও ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য স্থানে আংশিকরূপে বিরাজমানা।

নারায়ণের নিকট লক্ষ্মীর এই প্রকার উৎপত্তি বর্ণনা শ্রবণে নারদ পুনরায় তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন যে, তবে লক্ষ্মীদেবীকে সিন্ধুতনয়া বা সাগর হইতে উৎপন্না বলা হয় কেন? তখন নারায়ণ পুনরায় কিভাবে দুর্বাসামুনির অভিশাপে ইন্দ্র দেবগণসহ স্বর্গচ্যুত হইলে নারায়ণের উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যা করেন, নারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া সমুদ্র হইতে লক্ষ্মীদেবীকে উদ্ধার করিতে বলেন, নারায়ণের আদেশে তিনি (লক্ষ্মী) সিন্ধুতনয়ারূপে জন্মগ্রহণ করেন ও তখন দেব-দানব সকলে মিলিয়া সমুদ্রমন্থন করিয়াছিলেন ও ইন্দ্রাদি দেবগণ লক্ষ্মীদেবীকে উদ্ধার করিয়া পুনরায় হতশ্রী স্বর্গলাভ করেন—ইত্যাদি বলেন। তখন মরীচি, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহাকে পূজা ও স্তব করিতে লাগিলেন, এবং লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হইয়া কোন্ কোন্ স্থানে তিনি আংশিকভাবে অবস্থান করিবেন তাহা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। এইসব বর্ণনা 'লক্ষ্মীচরিত' নামে খ্যাত। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ২১-২২ অধ্যায়ে, গরুড়-পুরাণের ১১৪ অধ্যায়ে, স্কন্দপুরাণের লক্ষ্মীকেশবসংবাদে এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রভৃতিতেও এই লক্ষ্মীচরিত নানাভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং

ইহা অনেকেই অবগত আছেন। কোন্ কোন্ গুণযুক্ত ব্যক্তি বা স্ত্রী লক্ষ্মীর প্রিয় এবং কোন্ কোন্ স্থান তাঁহার প্রিয় তাহা এইসব বর্ণনায় বিশদভাবে লিপিবদ্ধ আছে।

পুজাব্যবস্থা—বিষ্ণু এবং স্বর্গস্থ দেবগণ ভাদ্র, পৌষ, চৈত্র এই তিনমাসে লক্ষ্মীপূজা করিয়াছিলেন। তদনুযায়ী ভারতেও এই তিন মাসে লক্ষ্মীপূজার বিধি প্রচলিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শুক্লপক্ষীয় বৃহস্পতিবারে, রবি ও সোমবারেও পূজা বিধেয়। কোন্ কোন্ তিথি ও নক্ষত্রে তাঁহার পূজা প্রশস্ত, স্মৃতিতে তাহা বিশদভাবে উল্লিখিত আছে। লক্ষ্মীপূজার সহিত নারায়ণ এবং কুবের দেবের পূজা করিতে হয়। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমাতিথিতে যে বিশেষ পূজা হয় তাহাকে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা ও কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যায় যে পূজা হয় তাহাকে দীপান্বিতা লক্ষ্মীপূজা বলে। লক্ষ্মীপূজার দিন সরস্বতী-পূজার ও সরস্বতীপূজার দিবস লক্ষ্মীপূজার বিধান দেখিতে পাওয়া যায় এবং স্ত্রীলোকদ্বারাও লক্ষ্মীপূজার বিধান আছে।

লক্ষ্মীদেবীর একাক্ষর বীজমন্ত্র 'শ্রীং'। দশাক্ষর মন্ত্র 'নমঃ কমল-বাসিন্যৈ স্বাহা' এবং মহালক্ষ্মীর দ্বাদশাক্ষর বীজমন্ত্র—ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং হেসা জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ।' এতদ্ব্যতীত 'ঐং শ্রীং হ্রীং ক্লীং' মন্ত্রও বীজরূপে প্রশস্ত। ধান্যাদি, পিষ্টক, পরমান্ন প্রভৃতি দ্বারা এবং শুক্লবর্ণ পুষ্প ও পদ্মপুষ্প দ্বারা তাঁহার পূজা বিধেয়। এই পূজায় ঘন্টাবাদ্য নিষিদ্ধ।

নিম্নে লক্ষ্মীদেবীর ধ্যান, প্রার্থনামন্ত্র ও প্রণামমন্ত্র প্রদত্ত হইল—

ধ্যানমন্ত্র—ওঁ পাশাক্ষ মালিকাম্ভোজ শৃণুভির্যাম্য সৌম্যয়োঃ
পদ্মাসনস্থং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম্ ॥১
গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্বালঙ্কারভূষিতাম্।
রৌক্মপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু ॥২

প্রার্থনামন্ত্র—নমস্তে সর্বভূতানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।
যা গতিস্ত্বং প্রপন্নানাং সা মে ভূয়াৎ তদর্চনাৎ ॥১

প্রণামমন্ত্র—বিশ্বরূপস্য ভার্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মী নমোঽস্তুতে ॥

নামকরণ—লক্ষ্মীদেবী বহুনামে খ্যাতা যথা—ঈশ্বরী, কমলা, লক্ষ্মী, চলা, ভূতি, হরিপ্রিয়া, পদ্মা, পদ্মালয়া, সম্পদ, রমা, শ্রী, পদ্মধারিণী ইত্যাদি।

মূর্তিপরিচয়—পুরাণাদিতে লক্ষ্মীদেবীর মূর্তিতে সামান্য ভিন্নতা লক্ষিত হয়। লক্ষ্মীদেবীর বর্ণ স্বর্ণতুল্য। কেবল বিষ্ণুধর্মোত্তরে তাঁহার বর্ণকে কাল বলিয়া লিপিবদ্ধ আছে। আর শিল্পরত্ন নামক গ্রন্থে লক্ষ্মীদেবীকে শ্বেতবর্ণ বলা হইয়াছে এবং ইহার এক হস্তে পদ্ম ও অন্য হস্তে বিল্বফল। কিন্তু অন্যান্য সব শাস্ত্রে দেবীর দুই হস্তেই পদ্ম এবং কোন কোন স্থানে ধান্য লক্ষিত হয়। দেখা যায়, যখন বিষ্ণুর সহিত পূজিতা তখন তিনি দ্বিভুজা, কিন্তু যখন পৃথকভাবে অবস্থিতা হ'ন তখন চতুর্ভুজা ও সিংহাসনোপরি স্থাপিত অষ্টদল পদ্মের উপরে আসীনা। দক্ষিণদিকের একহস্তে মৃণালযুক্ত পদ্ম, অন্য হস্তে বিল্বফল এবং বামদিকের একহস্তে অমৃতঘট এবং অন্যহস্তে শঙ্খ। তাঁহার দুই পার্শ্বে ২টী হস্তী শুণ্ডদ্বারা কুম্ভ হইতে তাঁহার

মস্তকে বারিসিঞ্চন করিতেছে। তাঁহার মস্তকেও পদ্ম এবং তিনি কেয়ূর ও কঙ্কণশোভিতা। এই চতুর্ভুজযুক্তা দেবীকে মহালক্ষ্মী বলা হয়। করবীর নগরে (বর্তমান কোহলাপুর) মহালক্ষ্মীর এই প্রকার একটী প্রসিদ্ধ মন্দির আছে, কিন্তু তাঁহার দক্ষিণদিকের নিম্নহস্তে পাত্র ও উপরহস্তে 'কৌমদকী' নামক গদা এবং বামদিকের নিম্নহস্তে বিল্বফল ও উপরহস্তে খেটক। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে লক্ষ্মীদেবীর অন্যনাম শ্রীদেবী। অনেক প্রাচীন মন্দিরে এই শ্রীদেবীর কতকাংশে ভিন্নপ্রকার মূর্তি দৃষ্ট হয়। ইলোরা, মহাবল্লীপুরম্ প্রভৃতি স্থানে শ্রীদেবীর মূর্তি আছে। মাদেয়ুর নামক স্থানে দণ্ডায়মানা এক লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি দৃষ্ট হয়, তিনি দ্বিভুজা। ভূদেবী (পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী)—লক্ষ্মীদেবার নামান্তর বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইঁহার বর্ণ সবুজাভ (কাঁচাধানের মত)। তাঁহার মস্তকে করণ্ড মকুট এবং তিনি বহু অলঙ্কার ও হরিদ্রাবর্ণ বস্ত্রশোভিতা, দ্বিভুজা এবং আসীনা বা দণ্ডায়মানা। এই ভূদেবীরও আবারবিভিন্ন মূর্তির বর্ণনা দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুধর্মোত্তরে দেখা যায় তিনি শ্বেতবর্ণা এবং চতুর্ভুজা—একহস্তে রত্নপাত্র, একহস্তে শস্যপাত্র, একহস্তে ঔষধিপাত্র ও অন্যহস্তে পদ্ম। তিনি চারিটী দিক্‌গজ বা হস্তীর পৃষ্ঠে উপবিষ্টা। 'পূর্বকারণাগমে' ভূদেবী কৃষ্ণবর্ণা, রক্তবস্ত্রপরিধানা, স্বর্ণাভ এবং যজ্ঞোপবীতশোভিতা বলিয়া বর্ণিতা হইয়াছেন।

দেবীর কোন কোন স্থানে এই প্রকার বিভিন্ন মূর্তি কল্পনার কারণ কি? সম্ভবতঃ তিনি ঐ প্রকার মূর্তিতে কোন কোন ভক্তকে দর্শন দিয়াছিলেন।

লক্ষ্মীতত্ত্ব—ঈশ্বর অনন্ত শক্তিস্বরূপ ও মাধুর্যের নিলয়। তাঁহার
ভিন্ন শক্তির বা বিভূতির বিকাশ বিভিন্ন দেবদেবীর মধ্য দিয়া।
ই সব দেবদেবীকে ঐসব শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেব বা দেবী বলা
ইতে পারে।

লক্ষ্মীদেবী স্থিতি বা পালনকর্তা শ্রীবিষ্ণুর ভার্যারূপে বর্ণিতা।
শ্বর্য, শোভা বা শ্রী ব্যতীত জগতের স্থিতি স্থায়ী হইতে পারে
। সেজন্য ইনি পালনকর্তা পুরুষোত্তম বিষ্ণুর শক্তি বা ভার্যারূপে
র্ণিতা। তিনি শ্রী বা ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সুতরাং তাঁহার
ধনায় দেবগণ বা মানবগণ ঐশ্বর্যলাভ করিয়া শ্রীমণ্ডিত হইবে
াতে বিচিত্রতা কি? বিভিন্ন দিবসে তিনি দেবগণ বা ঋষিগণের
জ্ঞায় আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, সেজন্য ঐসব দিবস তাঁহার পূজা
আরাধনায় প্রশস্ত।

পূজাপ্রচলন— লক্ষ্মীদেবী প্রথমে বৈকুণ্ঠে নারায়ণ কর্তৃক
জিতা হইলেন। পরে ব্রহ্মা ও মহাদেব তাঁহাকে পূজা করেন।
হ্মা ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী হইতে সমস্ত পক্ষ তাঁহাকে পূজা করিয়া-
লেন। ভাদ্র, পৌষ, চৈত্রমাসের শুভদিনে বিষ্ণু তাঁহার পূজা
রেন। ভারতে প্রথমে স্বায়ম্ভুব মনু এবং পরে অন্যান্য ঋষি
ন ও রাজগণ তাঁহার পূজা প্রচলন করেন। পৌষ মাসের সংক্রান্তি
ন মনু প্রাঙ্গণমধ্যে লক্ষ্মীপূজা করিয়াছিলেন। পাতালে নাগ-
ও তাঁহার পূজা প্রচলিত করেন। এইভাবে সর্বত্র তাঁহার পূজা
ল। তাঁহার পূজাপদ্ধতির আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

ইহাই অতি সংক্ষেপে লক্ষ্মীদেবীর পরিচয়। ইনি 'সোনার বরণী

রাণী' বলিয়া গীত হ'ন। ইঁহার কৃপায় দেশ ধনেধান্যে শ্রীসুষমায় শোভিত হয়। দেবভূমি ভারত ইঁহার আশীর্বাদে দুঃখদারিদ্র্যমুক্ত হইয়া সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা হউক, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীকার্ত্তিকেয়

সংজ্ঞা—ইনি মহাদেব-পুত্র। কৃত্তিকা প্রভৃতি ৬টি নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরা যাঁহারা চন্দ্রদেবের স্ত্রী—তাঁহাদের দ্বারা ইনি পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম কার্ত্তিকেয়। [কৃত্তিকানামপত্যম্ পাল্যত্বেন ইতি কৃত্তিকা+ঢক্ (স্ত্রী-ভ্যোঢক্—পা.৪।২।১৩)]। ইঁহার অন্যান্য নামও আছে। যথা মহাসেন, শরজন্মা, ষড়ানন, পার্বতী-নন্দন, স্কন্দ, সেনানী, অগ্নিভূ, গুহ, বাহুলেয়, তাড়কজিৎ, বিশাখি, শখিবাহন, ষান্মাতুর, শক্তিধর, কুমার, ক্রৌঞ্চদারণ, আগ্নেয়, দীপ্তকীর্তি, অনমেয়, ময়ুরকেতু, ধর্মাত্মা, ভূতেশ, মহিষার্দশ, কামজিৎ, কামদ, কান্ত, সত্যবাক্, ভুবনেশ্বর, শিশু, শীঘ্র, সূচি, চণ্ড, দীপ্তবর্ণ, শুভানন, অমোঘ, অনর্ঘ, রৌদ্র, প্রিয়, চন্দ্রানন, দীপ্তশক্তি, প্রশান্তাত্মা, ভদ্রকৃৎ, কূটমোহন, ষষ্ঠীপ্রিয়, পবিত্র, মাতৃবৎসল, কন্যাভর্ত্তা, বিভক্ত, স্বাহেয়, রেবতীসুত, প্রভু, নেতা, নৈগমেয়, সুপুশ্চর, সুব্রত, ললিত, বাল-ক্রীড়নপ্রিয়, খচারী, ব্রহ্মচারী, দেবসেনাপতি, গাঙ্গ, দ্বাদশলোচন, ষট্‌শিরা, পাবকাত্মজ ইত্যাদি। প্রত্যেক নামেরই অর্থ আছে এবং কার্ত্তিকেয়ের কাহিনী হইতে বিশেষণমূলক এই প্রকার আরও বহুসংজ্ঞা দিতে পারা যায়।

কাহিনী—বিভিন্ন পুরাণে কার্ত্তিকেয়ের জন্মের কাহিনী আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে দেখা যায় শিব পার্বতীর সহিত ক্রীড়া করিবার সময় তাঁহার বীর্য ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয়, ভূমি তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া অগ্নিতে, অগ্নি আবার শরবনে নিক্ষেপ করে এবং তথায়

এই সন্তানের জন্ম হয় এবং কৃত্তিকাদি দেবীগণ কর্তৃক ইনি পালি
হইয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম হয় কার্ত্তিকেয়। কৃত্তিকা প্রমু
৬ জন দেবীর একসঙ্গে স্তন্যপান সময়ে ইঁহার ৬টী আনন হইয়
ছিল, সেজন্য ইঁহার নাম ষড়ানন।

রামায়ণে আছে অন্য এক কল্পে ইনি পুনর্বার অগ্নিপুত্ররূপে
গঙ্গাগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেবারেও কৃত্তিকাগণ ইঁহাকে পাল
করিয়াছিলেন।

বামন পুরাণে আছে অগ্নিকর্তৃক পরিত্যক্ত মহাদেবের তে
হিমালয়ের অন্যতমা কন্যা কুটিলা ধারণ করেন এবং তিনি পর্বতে
পার্শ্ববর্ত্তী এক শরবনে এই পুত্র প্রসব করেন আর কৃত্তিকাগ
তাঁহাকে পালন করেন। কৃত্তিকাদের পুত্ররূপে তিনি কার্ত্তিকে
কুটিলার পুত্ররূপে তিনি কুমার, গৌরীর পুত্ররূপে স্কন্দ (পার্বতী
জন্য মহাদেবের তেজ স্কন্ন অর্থাৎ ক্ষরিত হইয়াছিল বলিয়া), গু
(গুহাবাস নিবন্ধন), হুতাশন অগ্নির পুত্ররূপে মহাবসন নামে খ্যাত
আবার বিষ্ণুপুরাণে আছে মহাদেবের ঔরসে স্বাহার গর্ভে তাঁর জন্ম।

এই প্রকার বিভিন্ন কাহিনী হইতে এই জানা যায় যে কাৰ্ত্তি
কেয়ের উৎপত্তি হয় মহাদেব ও পার্বতী হইতে। পার্বতীর গর্
তিনি জন্মান নাই—সংকর্ষণ দ্বারা পার্বতীর অন্য ভগিনী কুটিলা
গঙ্গার গর্ভে তিনি হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে শরবনে পতিত দেখি
কৃত্তিকারা লালন পালন করেন।

ইঁহার উৎপত্তির কারণ সব পুরাণেই এক কথা। তাড়কাসুরে
অত্যাচারে দেবগণ বিব্রত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে ব্রহ্মা বলে

মহাদেব ও পার্বতী হইতে যে তনয় উৎপন্ন হইবে, তিনি হইবেন দেবসেনাপতি এবং তাঁহার দ্বারাই তাড়কাসুর নিহত হইবে। দেবতারা তদনুযায়ী মহাদেবের নিকট গমন করেন।

সতীর দেহত্যাগের পর হইতে মহাদেব হিমালয় প্রদেশে মহা-সমাধিমগ্ন। এদিকে সতী পুনরায় হিমালয়রাজ কন্যারূপে জন্মিয়াছেন ও পার্বতী বা উমা নামে খ্যাতা। মহাদেবকে পতিরূপে পাইবার জন্য তিনিও কঠোর তপস্যা করিতেছেন। এবং সমাধিস্থ মহাদেবের নিকটে থাকিয়া তাঁহার পূজা ও অর্চনাদি করেন। দেবতারা সুযোগ বুঝিয়া কামদেবকে লইয়া মহাদেবের ধ্যানভঙ্গের চেষ্টা করেন। মহাদেবের রোষে কামদেব ভস্মীভূত হইলেন। তৎপরে পার্শ্বস্থ পার্বতীকে দেখিয়া তাঁহার সহিত বিহার করেন ও কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি হয়। অন্যকল্পে যে অগ্নিপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ কথা আছে তাহার অর্থ এই যে, মহাদেবের পরিত্যক্ত তেজ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে অগ্নি কতৃক তাহা গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত হয় এবং সম্ভবতঃ গঙ্গাতটের নিকটে কোন শরবনে কাত্তিক জন্মান। অবশ্য মানবজন্ম এভাবে হইতে পারে না। কিন্তু দেবতাদের মানসক্রিয়া বা ইচ্ছা-দ্বারাতেই যখন সৃষ্টি হইতে পারে তখন এই প্রকার উৎপত্তি অসম্ভব নহে। সুতরাং মহাদেব ও পার্বতী হইতেই কাত্তিকের জন্ম এবং তাড়কাসুরবধ ও দেবসেনাপতিরূপে দেবতাদিগকে অসুরাদি হইতে রক্ষা করাই তাঁহার কার্য ছিল।

মূর্তিপরিচয়—নিম্নলিখিত ধ্যানমন্ত্র হইতে তাঁহার মূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়—

কার্ত্তিকেয়ং মহাভাগং ময়ূরোপরি সংস্থিতম্।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং শক্তিহস্তং বরপ্রদম্॥
দ্বিভুজং শত্রুহন্তারং নানালঙ্কারভূষিতম্।
প্রসন্নবদনং দেবং সর্বসেনা সমাবৃতম্॥

অর্থাৎ তিনি ময়ূরের উপর অবস্থিত, তপ্তস্বর্ণবর্ণযুক্ত, শক্তিহস্ত, দ্বিভুজ, নানালঙ্কারভূষিত, প্রসন্নবদন এবং দেবসেনাদের দ্বারা পরিবৃত। সুতরাং তিনি প্রকৃতপক্ষে ষড়ানন নহে।

কার্ত্তিকেয়ের স্ত্রীর নাম দেবসেনা। ইনি প্রকৃতির প্রধান অংশভূতা মাতৃকাদের অন্যতমা এবং ষষ্ঠীনামে বিখ্যাতা (ব্রহ্মা বৈ)। কার্ত্তিকেয়ের পুত্রের নাম বিশাখা (ভাগবত)। অনেকে পুত্র কামনায় কার্ত্তিকেয় ব্রত (পূজা) করেন, সম্ভবতঃ ইনি সন্তানদের রক্ষাকর্ত্রীদেবী ষষ্ঠীর পতি বলিয়া।

কার্ত্তিক-পত্নী দেবসেনাও এক যোদ্ধৃদেবী এবং তাঁহারও স্বামীর ন্যায় অস্ত্রাদি আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে—

কৌমারী শক্তিহস্তা চ ময়ূরোপরি সংস্থিতা।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ তত্র অম্বিকা গুহরূপিনী।

সুতরাং ইনিও ময়ূরাসীনা; এবং দেবী আদ্যাশক্তিরই অংশবিশেষ।

মৎস্য পুরাণ হইতে দেখা যায় কার্ত্তিকেয় যখন তাড়কাসুরবধে যান তখন দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধচারণগণ সকলেই তাঁহাকে দিব্যাস্ত্র ও সেনার দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন।

কার্ত্তিকেয়ের পূজা কার্ত্তিকমাসের শেষ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমস্ত পূজাই তিথি বিশেষে হয়। কেবল মাত্র এই পূজাই

(সম্ভবতঃ ইহাকে কার্ত্তিকেয়ব্রতরূপে গণ্য করা হয় বলিয়া) নির্দিষ্ট সৌর দিবসে অনুষ্ঠিত হয়। রুদ্রযামল নামক তন্ত্রগ্রন্থে "যোগীশ্বরো মহাসেন......................মাত্র কার্য বিচরণা" এই একটি কার্ত্তিকেয়ের স্তব আছে।

আর্যদের প্রত্যেক দেবদেবীই কোন একটি বিশেষ গুণ, শক্তি বা আদর্শের প্রতীক। কার্ত্তিকেয় তদ্রূপ আদর্শ শক্তিমান সেনা-পতিরূপে আরাধ্য দেবতা। ভারতীয় শাস্ত্রসমূহের মধ্যে শস্ত্রবিদ্যা বা ধনুর্বেদশাস্ত্র অন্যতম এবং এই বিদ্যারই আরাধ্য দেবতা কার্ত্তিকেয়। বর্তমান ভারতের প্রত্যেক সন্তানেরই শ্রী, সৌন্দর্য ও শৌর্য-প্রতীকরূপে কার্ত্তিকেয় পূজ্য।

শ্রীশ্রীদুর্গা

সংজ্ঞা—সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী আদ্যাশক্তিই দুর্গাদেবী নামে প্রখ্যাতা। দুর্গার সহস্র নাম আছে যথা—উমা, কাত্যায়নী, কালী, হৈমবতী, ঈশানী, সতী, নারায়ণী, চণ্ডী, মহিষমর্দিনী, চামুণ্ডা, মহামায়া, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, বাসন্তী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, ইত্যাদি। প্রত্যেক নামেরই এক বা ততোধিক অর্থ আছে। যেমন 'দুর্গা' শব্দের অর্থ (ক) যিনি স্মরণমাত্রেই ইন্দ্রাদি দেবগণকে দুর্গম শত্রু হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন (দেবীপুরাণ. ২৭ অঃ) (খ) যিনি দুর্গা নামক মহাসুরকে বিনাশ করেন তিনি দুর্গাদেবী (মার্কেণ্ডেয় পুরাণ, দেবী মাহাত্ম্য) (গ) দুর্গা নামক দৈত্য, মহাবিঘ্ন, সংসারবন্ধন, কর্ম, দুঃখ, নরক, জন্ম, মহাভয় প্রভৃতিকে যে দেবী হনন করেন তিনিই দুর্গা (ব্রহ্মবৈ. পুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড ৫৭ অঃ) ইত্যাদি। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডের ৫৭ অধ্যায়ে এবং দেবীপুরাণের ৩৭ অধ্যায়ে দেবী দুর্গার বিভিন্ন নামের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে।

দেবীর স্বরূপ—ইনি পরমাপ্রকৃতি। সাংখ্যদর্শন মতে পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুইটী সৃষ্টির মূলতত্ত্ব। এই প্রকৃতি শক্তিস্বরূপা দেবী। বেদান্তদর্শনের মতে নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত যখন মায়া বা শক্তির মিলন হইয়া সগুণ ব্রহ্মের উদ্ভব হয়, তখন সেই সগুণ ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হয়; তিনিই পরম পুরুষ বিষ্ণু। যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তির প্রভেদ দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ ব্রহ্ম ও

ব্রহ্মশক্তির প্রভেদ নাই। এই মহাশক্তিই দেবীদুর্গা প্রভৃতি নামে পরিচিতা। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে দেবীর বিভিন্ন শক্তির পরিচয় দেওয়া আছে, যেমন দেবীদুর্গাই তপস্বীগণের তপস্যা, ভক্তগণের ভক্তি' মুক্তগণের মুক্তি ও সাংসারিকগণের মায়াশক্তি, তিনিই বুদ্ধি ও মেধাশক্তি ইত্যাদি। এই দেবীর করুণাতেই ভক্তিলাভ, মুক্তিলাভ হয়। জড়প্রকৃতিরও অন্তর্হিত শক্তিই দেবী-শক্তি, যেমন সূর্যের প্রভাশক্তি, জলের শৈত্যশক্তি, অগ্নির দাহিকাশক্তি, ইত্যাদি।

বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকেরা পূর্বে পরমাণুবাদ প্রচার করিতেন, কিন্তু বর্তমানে এই পরমাণুবাদ হইতে শক্তিবাদ প্রবর্তিত হইয়াছে। জড়প্রকৃতি অণু ও পরমাণুর সংযোগ, আর এই পরমাণু কিছুই নহে, শক্তির (energy) সমষ্টি মাত্র। এই যে জড়প্রকৃতির অন্তর্ভূত শক্তি ইহাই পরমাশক্তি, দেবীর বিকাশশক্তি। ইনি চৈতন্যস্বরূপা, জড় বা অজ্ঞান নহে। শক্তিবিকাশের তারতম্যেই জড়, অজ্ঞান, বা চৈতন্য। জড় ও চৈতন্যের (Matter and Spirit) স্বরূপতঃ প্রভেদ নাই, বিকাশের তারতম্য মাত্র।

দেবী দুর্গাই এই অনন্তশক্তির আধারভূতা মহাদেবী। বিভিন্ন শক্তির বিকাশেই তিনি বিভিন্ন নামে পরিচিতা।

দুর্গাদেবীর ইতিহাস—মোক্ষমূলার প্রভৃতি কোন কোন পণ্ডিতের মতে দুর্গাদেবী বৈদিক দেবতা নহেন। ইনি অনার্যদিগের দেবতা; আর্য-অনার্য সংমিশ্রণের পরে আর্য-দেবতারূপে পূজিতা হইতে থাকেন। এই মত ভ্রমপ্রসূত এবং বৈদিকসাহিত্য. আলোচনা করিলেই তাহা জানা যায়। ঋগ্বেদের ১,১০৬,৩ মন্ত্রে আছে

"জ্যোতিষ্মতীমদিতিং ধারয়েৎ ক্ষিতিসর্বতীমা" অর্থাৎ "যজমান জ্যোতিষ্মতী সম্পূর্ণলক্ষণা স্বর্গপ্রদায়িনী বেদী প্রস্তুত করিয়াছিলেন"। সে সময় অর্থাৎ বৈদিকযুগের প্রথমে ঋষিরা বেদী বা কুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া ধ্যান করিতেন। সে সময় বেদিতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইত না। তারপর তাঁহারা বেদিতে অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে লাগিলেন, আর তার জন্য হবিঃ (ঘৃত) প্রভৃতি দানের ব্যবস্থা করিলেন। দক্ষ বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং সেজন্য যজ্ঞবেদি বা কুণ্ডের নাম 'দক্ষ-তন' (দক্ষ-তনয়া) হইল (ঋ, ৩,৩,৯,)। অগ্নিদেবতার বৈদিক নাম রুদ্র বা মহাদেব। এই অগ্নি বেদি আলিঙ্গন করিয়া থাকিত বলিয়া পরবর্তীকালে যজ্ঞবেদি বা দক্ষ-তনয়াকে অগ্নিদেব মহাদেবের স্ত্রীরূপে প্রচার করা হইল। সুতরাং দেখা যাইতেছে বৈদিকযুগে দেবী দুর্গার বর্তমান মূর্তি কল্পনা না থাকিলেও ইহার বীজ যজ্ঞবেদি ও অগ্নিদেব 'রুদ্র' মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই—যজ্ঞবেদি ও অগ্নি হইতে কি প্রকারে পরে দেবী দুর্গার পরিকল্পনা হইল? অগ্নি দেবতাদের নিকট যজ্ঞের হব্য বহন করিয়া লইয়া যাইতেন বলিয়া তাঁহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম হব্যবাহিনী। এই হব্যবাহিনীই পরে দুর্গামূর্তিতে পরিণতা হইলেন। যজ্ঞকুণ্ডের দশ দিক দুর্গার দশহাত। অগ্নির পীত বর্ণ হইতে দুর্গার পীতবর্ণ কল্পিত হইল। যজ্ঞবেদিতে অন্যান্য দেবতা সংস্থাপনের ব্যবস্থা ছিল, যেমন এক দেবী যজ্ঞজ্ঞানদাত্রী বা মূর্তিবৎ বেদজ্ঞান ইনিই পরে সরস্বতী হইলেন; এক দেবী যজ্ঞানুষ্ঠানের

অর্থ ব্যবস্থা করিতেন, ইনিই হইলেন লক্ষ্মী। ইত্যাদিরূপে দশভূজা দুর্গার সহিত লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ প্রভৃতির ব্যবস্থা পরবর্তী যুগে হইল। তৈত্তিরীয় আরণ্যকেই (১০।১৮) মহাদেব, দুর্গা, কার্তিক, গণেশ, নন্দি প্রভৃতির একত্র সমাবেশ দেখা যায়। ঋগ্বেদের খিলসূক্তে (২৫) এবং তৈ. আঃ (১০।১) গ্রন্থে দুর্গাদেবীকে রাত্রিদেবীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এইরূপে পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে দেবী দুর্গা অনার্য দেবতা নহেন—বৈদিক আর্য দেবতা। পরবর্তী পৌরাণিক যুগে ইঁহাদের ধ্যান, মূর্তিকল্পনা ও পূজা-আরাধনার বিশেষ প্রথা প্রচলিত হইল। বৈদিক সাহিত্যেই কয়েকটী দুর্গাগায়ত্রী আছে যথা—"কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারিং ধীমহি তন্নো দুর্গি প্রচোদয়াৎ" (তৈত্তি: আ. ৯ম অনুবাক) ইত্যাদি—এইগুলি হইতেই পরে দুর্গার ধ্যানমন্ত্র প্রবর্তিত হয়। তারপর বহ্বৃচ্ উপনিষদ্ ও দেবী-উপনিষদ্ হইতে দেবীর শক্তির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। মহাভারত ও হরিবংশেও দেবীর বর্ণনা উক্ত উপনিষদের বর্ণনার অনুরূপ।

কালিকাপুরাণ, (৪৫ অঃ) দেবী ভাগবত (৮।৮ অঃ) প্রভৃতি হইতে দেবীর পৌরাণিক পরিচয় সম্যগ্রূপে পাওয়া যায়। কালিকাপুরাণে আছে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর পরব্রহ্মের (সগুণ ব্রহ্মের) বিভিন্ন শক্তির অংশরূপে আবির্ভূত হ'ন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সৃষ্টি ও স্থিতির জন্য নিজ নিজ শক্তিকে (পত্নী) গ্রহণ করিলেন, কিন্তু মহাদেব তাহা না করিয়া ধ্যানে মগ্ন রহিলেন। তখন ব্রহ্মা স্বীয় মানসপুত্র দক্ষকে বলিলেন 'দক্ষ! তুমি জগন্মাতার পূজা কর, তিনি যেন তোমার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মহেশ্বরের পত্নী হ'ন। তদনুসারে দক্ষ প্রজাপতি তিন সহস্র

দিব্যবৎসর কঠোর তপস্যা করেন। তারপর মহামায়া আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন "আমি তোমার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শঙ্করপত্নী হইব ও যখন তুমি আমাকে অনাদর করিবে তখন দেহত্যাগ করিব"। তদনুসারে দেবী দক্ষপত্নী বারিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন ও মহাদেবকে পূজায় তুষ্ট করিয়া তাঁহার সহিত মিলিতা হইলেন। তারপর তাঁহারা কৈলাস শিখরে ও হিমালয়স্থ মহাকৌষা নামক নদীপ্রপাতের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইহার কিছুকাল পরে দক্ষ এক মহাযজ্ঞ করিলেন ও সেখানে মহাদেবকে অপমানিত করায় দক্ষকন্যা সতী প্রাণত্যাগ করেন। মহাদেব সতীর শব স্কন্ধে লইয়া বিলাপ করিতে করিতে পূর্বাভিমুখে যাত্রা করেন; তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শনি সতীর শবদেহে প্রবেশ করিয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। যে যে স্থানে সতীর অঙ্গ পতিত হইল তাহা পরে মহাপীঠে পরিণত হইল। (এইরূপে ভারতে ৫১টী পীঠস্থানের সৃষ্টি হয়)।

মহাদেব প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার যোগাসীন হইলেন। এই সময় হিমালয়রাজ-পত্নী মেনকা পুত্রকামনায় দীর্ঘ ২৭ বৎসর যাবৎ মহামায়ার পূজা করেন। দেবী তাঁহার পূজায় তুষ্টা হইয়া আবির্ভূতা হইলে মেনকা তাঁহার নিকট একশত বীর পুত্র ও এক ভুবনমোহিনী কন্যা প্রার্থনা করেন। ভগবতী তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন ও নিজে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। বসন্তকালে মৃগশিরা নক্ষত্রে নবমী তিথিতে অর্ধরাত্রি সময়ে দেবী মেনকাকন্যারূপে আবির্ভূতা হইলেন। হিমালয়রাজ তাঁহার নাম রাখিলেন 'কালী' ও বন্ধুগণ নাম রাখিলেন 'গৌরী'। তারপর একদিন নারদ আসিয়া হিমালয় রাজকে বলিলে,

যে তাঁহার কন্যা তপস্যায় মহাদেবকে প্রসন্ন করিলে তিনি সুবর্ণের ন্যায় গৌরাঙ্গী হইবেন ও মহাদেবকে পতিরূপে পাইবেন। মহাদেব তখন হিমালয়ের ওষধিপ্রস্থ নগরের নিকট একস্থানে তপস্যা করিতেছিলেন। পার্বতী পিতাসহ সেখানে যাইয়া মহাদেবের পূজায় নিযুক্তা হইলেন। এই সময় তারকাসুর দেবতাদিগকে দূর করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিলেন। দেবতারা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা বলিলেন মহাদেবের ঔরসজাত পুত্র ব্যতীত কেহই তারকাসুর বধ করিতে পারিবেন না। তখন দেবতারা মদন ও রতিকে মহাদেবের নিকট পাঠাইলেন। তাঁহার রোষানলে মদন ভস্ম হইল। তখন পার্বতীর বিরহজ্বালা বাড়িয়া উঠিল। তিনি পঞ্চবিধ তপস্যা করিয়া ক্ষীণা হইয়া পড়িলেন। তখন মহাদেব তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিলেন এবং কৈলাস পর্বতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় একদিন মহাদেব উর্বশীকে দেখিয়া পার্বতীকে "ভিন্নাঞ্জন শ্যামলে কালি" বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। পার্বতী রুষ্টা হইয়া মহাকৌষী প্রপাত নামক স্থানে গিয়া একশত বৎসর তপস্যা করিয়া অন্তরে বাহিরে কেবল মহাদেবকেই দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন তিনি আকাশ গঙ্গার জলে স্নান করিয়া বিদ্যুতের মত গৌরবর্ণা হইলেন। পরে ইঁহাদের কার্তিক ও গণেশ এই দুই পুত্র হয়। ইহাই সংক্ষেপে দেবীর হিমালয় প্রদেশে আবির্ভাব-কাহিনী হরিদ্বারের নিকটস্থ কন্‌খল্‌ নামকস্থান দক্ষরাজের রাজধানী ছিল, আর এই স্থানেই দক্ষযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু হিমালয়রাজের রাজধানী কোথা ছিল তাহার লিখিত পরিচয় পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ ইহা বর্তমান টেহরী গাড়োয়াল স্থানের

অন্তর্গত। কথিত আছে বর্তমান ত্রিযুগীনারায়ণ নামক স্থানে শিব-পার্বতীর বিবাহ হইয়াছিল। ইহা হিমালয়স্থ কেদারনাথের পথে এবং রুদ্রপ্রয়াগ হইতে প্রায় ৪০ ক্রোশ দূরে। সুতরাং ইহাই হিমালয়রাজ হিমবানের রাজধানী ছিল বলা যাইতে পারে। এখানে সেই বিবাহের সময় হইতে এখনও অগ্নি কুণ্ড প্রজ্বলিত রাখা হইয়াছে। এবং এখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের নামে তিনটী কুণ্ড আছে।

এই দেবীদুর্গা দেবগণের সঙ্কটত্রাণের জন্য ও বিভিন্ন অসুরবধের জন্য বিভিন্নরূপে অনেকবার আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। দেবীভাগবত, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী প্রভৃতিতে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। মহাভাগবত, বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ, বৃহদ্-ধর্ম পুরাণ প্রভৃতি হইতে তাঁহার আবির্ভাবের অনেক বিবরণ জানিতে পারা যায়।

দেবীর পূজা প্রচলন—রামচন্দ্রই দুর্গাপূজাকে নৈমিত্তিক পূজা-রূপে প্রথম প্রচলন করেন। রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা মহাভারতের বনপর্বে (২৮-৩০ অধ্যায়) দেখিতে পাই তিনি রাবণবধের জন্য শরৎকালে নবরাত্রব্রত অনুষ্ঠান করিয় দুর্গাপূজা করেন। বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতিতেও রামচন্দ্র কর্তৃক দুর্গাপূজার বিভিন্ন বিবরণ আছে। রামচন্দ্র ১০৮টি নীলপদ্ম দিয়া দেবীর পূজায় প্রবৃত্ত হ'ন, দেবী তাঁহাকে পরীক্ষ করিবার জন্য যখন একটী পদ্ম লুকাইয়া রাখেন তখন রামচন্দ্র নিজ চক্ষু উৎপাটন করিতে প্রবৃত্ত হইলে দেবী তুষ্টা হইয়া তাঁহাবে বরপ্রদান করেন। রাবণ কর্তৃক বসন্তকালে যে দুর্গাপূজা হইয়াছি তাহাকে বাসন্তী পূজা বলে, আর রামচন্দ্র কর্তৃক শরৎকালের

পূজাকে শারদীয় পূজা বলে। অনেকে শরৎকালের পূজাকে অকাল পূজা বলেন, কিন্তু বৈদিক যুগেও এই শারদীয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। অবশ্য বর্তমানের শারদীয়া পূজা সে সময় ছিল না। বাজসনেয় সংহিতা (২১।২৬), তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (২৬।১৯।২), মৈত্রায়ণী সংহিতা (৩।১১।১২ ও ১৫।৯।৭) প্রভৃতি হইতে "শারদেন ঋতুনা দেবাঃ" প্রভৃতি বাক্যে দেখা যায় যে শরৎ ঋতুই দেবার্চনের প্রশস্ত সময়। বৈদিক-যুগে শরৎকালে একটি বিশিষ্ট শারদীয়া অনুষ্ঠান হইত, তাহার নাম 'একাষ্টকা' পূজা। ইহা হইতেই পরে অষ্টভুজামূর্তির কল্পনা পরিগৃহীত হয়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আছে (৬১।৫৫) সমাধিবৈশ্য ও সুরথরাজাও শরৎকালে ভগবতী দুর্গাদেবীর পূজা করিয়াছিলেন। চণ্ডীতে দেখা যায় তাঁহারা বহু বর্ষ যাবৎ দুর্গাদেবীর ধ্যান তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। সম্ভবতঃ শরৎকালেই এই পূজার উদ্‌যাপন করেন। বসন্তকালে দেবী পূজার প্রথম পরিচয় পাই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে। গোলকে শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলের মধ্যে মধুমাসে বসন্তকালে দেবীপূজা করিয়াছিলেন। তারপর বিষ্ণুও এই মধুমাসে মধুকৈটভবধের জন্য পূজা করেন। তারপর তিনি ত্রিপুরানাশের জন্য মহাদেব কর্তৃক পূজিতা হ'ন। পরে ইন্দ্র শুভ নবরাত্রব্রত অনুষ্ঠান করিয়া দুর্গা পূজা করেন। ইহার পর হইতেই দেবী সম্পূজিতা হইতে থাকেন। পরে বিশ্বামিত্র, ভৃগু, বশিষ্ঠ ও কশ্যপ ঋষিরাও এই নবরাত্র ব্রত অনুষ্ঠান করিতেন (দেবীভাগবত ৩।৩০।২৫)। মৃন্ময়ীমূর্তি গড়িয়া তাঁহার পূজা ও পূজান্তে বিসর্জন এই প্রথা প্রথম প্রচলন করিলেন রাজা সুরথ (ইনি মেধস ঋষির আশ্রমে পূজা করিয়াছিলেন) ও

সমাধিবৈশ্য (ইনি নদীতটে পূজা করিয়াছিলেন)। পরে যুধিষ্ঠির, অর্জুন প্রভৃতিও দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। সে সময় তাঁহারা বিন্ধ্য-বাসিনী দেবীর পূজা করিতেন। মহাভারতের যুগে যে দুর্গোৎসব প্রচলিত ছিল তাহা মহাভারতে দুর্গামূর্তি ও পূজার বর্ণনা হইতে পাওয়া যায়। এই সময়ে দুর্গার বিভিন্ন মূর্তির ধ্যান ও পূজা, যেমন কুমারী, কালী, কৃষ্ণপিঙ্গলা, ক্যাত্যায়নী প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। এইরূপে দেখা যায় ভারতে বহু প্রাচীনকাল হইতে দুর্গা পূজা প্রচলিত আছে। আর শরৎকাল ও বসন্তকাল এই উভয় সময়েই এই পূজা অনুষ্ঠিত হইত। উভয় পূজাই প্রায় একরূপ। তবে শরৎকালের পূজাকে 'অকাল' পূজা বলা হয়, আর সেজন্য 'বোধন' এই পূজার একটি বিশেষ অঙ্গ। 'অকাল' শব্দের অর্থ কি ? সৌর বর্ষের মকর সংক্রান্তি হইতে ৬ মাস অর্থাৎ মাঘ হইতে আষাঢ় পর্যন্ত কালকে উত্তরায়ণ বলে ; আর কর্কট সংক্রান্তি হইতে ৬ মাস অর্থাৎ শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্যন্ত কালকে দক্ষিণায়ণ বলে। শাস্ত্রানুসারে দেবতারা উত্তরায়ণে জাগ্রত থাকেন ও দক্ষিণায়ণে নিদ্রিত থাকেন। বলা প্রয়োজন মানবের একবর্ষ দেবতাদের একদিন। দেবতারা যখন জাগ্রত থাকেন তাহাকে 'কাল' বলে ও যখন নিদ্রিত থাকেন তাহাকে 'অকাল' পূজা বলে এবং এইজন্যই শারদীয়া পূজাকে 'অকাল' পূজা বলে এবং দেবতাদের নিদ্রাভঙ্গের জন্য 'বোধন' করিতে হয়। নবরাত্র ব্রতই এই বোধন।

তত্ত্ব—দুর্গাপূজা শক্তি-উপাসনা। দুর্গা বিশ্বশক্তিরই যেন ঘনীভূত মূর্তি আদ্যাপ্রকৃতি। মানবের মধ্যেও এই অনন্ত বিশ্বশক্তির বীজ

নিহিত রহিয়াছে. কারণ মানব এই আদ্যাশক্তি হইতেই উৎপন্ন। মানবমধ্যস্থ এই মহাশক্তির নাম কুণ্ডলিনীশক্তি। সমগ্র যোগশাস্ত্রের, সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্দেশ্যই হইতেছে এই কুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগ্রত করা। ইহার নাম ষট্ চক্রভেদ ; অর্থাৎ মূলাধার—স্বাধিষ্ঠান--মনিপুর—অনাহত—বিশুদ্ধি—আজ্ঞা এই ছয়টী চক্র মেরুদণ্ডের মধ্যে কল্পিত এবং কুণ্ডলিনী শক্তি সাধনার দ্বারা যখন মূলাধার হইতে আজ্ঞায় উপস্থিত হয়, তখন শক্তি জ্যোতিরূপে বিচ্ছুরিত হয়। কিভাবে বীজমন্ত্র, চক্র, যন্ত্র প্রভৃতির সাহায্যে এই শক্তিকে জাগ্রত করিতে হয় তাহা তন্ত্রশাস্ত্রে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। আবার প্রাণায়ামাদি অষ্টমাগিক যোগদ্বারাও এই সাধনা হইয়া থাকে এবং তৎসমুদয় যোগশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে।

এই পরমা প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী মহাকালীরূপে, মূর্তিমতা বিকাশ। এবং তিনি যুগে যুগে আবির্ভূতা হ'ন এবং কোন্ সময়ে কি নামে আবির্ভূতা হইয়াছেন ও হইবেন তাহা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর মধ্যেই উল্লিখিত আছে।

পূজা-বিধি—এই শারদীয় পূজার ৪টী প্রধান কর্ম—স্বপন, পূজন, হোম ও বলিদান। তিনদিন যাবৎ এই পূজা করিতে হয়—আশ্বিন মাসের শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথি। এই পূজার ৭টী কল্প (সময়) নির্ধারিত আছে যথা--(১) নবম্যাদি কল্প—ভাদ্র মাসের কৃষ্ণানবমী হইতে আশ্বিন মাসের মহানবমী পর্যন্ত যে পূজা করা হয় তাহাকে নবম্যাদি কল্প বলে (২) প্রতিপদাদিকল্প—আশ্বিন মাসের শুক্লা প্রতিপদ হইতে মহানবমী পর্যন্ত (৩) ষষ্ঠ্যাদি কল্প---আশ্বিনের শুক্লা

ষষ্ঠী হইতে মহানবমী পর্যন্ত (৪) সপ্তম্যাদি কল্প—মহাসপ্তমী হইতে মহানবমী পর্যন্ত (৫) অষ্টম্যাদি কল্প—মহাষ্টমী ও মহানবমী (৬ অষ্টমী কল্প কেবল মহাষ্টমীর দিন (৭) নবমীকল্প—কেবল মহানবমী দিন। এই পূজা আবার সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই ৩ প্রকার নিরামিষ নৈবেদ্য, জপ ও যজ্ঞাদি ও ভগবতীর মাহাত্ম্যপাঠ, দেবীসূক্ত জপ প্রভৃতি সাত্ত্বিকী পূজা ; বলিদান, আমিষ নৈবেদ্যাদি রাজসিকপূজা এবং জপযজ্ঞ বিনা কেবল সুরামাংসাদি উপহারে যে পূজা উহা তামসিকী পূজা এবং নিন্দনীয়। কোন্ তিথি কি নক্ষত্রযুক্ত হইলে বিভিন্ন কল্পের বোধন প্রশস্ত সে বিষয় রঘুনন্দনকৃত তিথিতত্ত্বের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। নবমীতে বোধন করিয়া জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত ষষ্ঠী তিথিতে বিল্ববৃক্ষে আমন্ত্রণ, মূলানক্ষত্রযুক্ত সপ্তমীতে পত্রিকা প্রবেশ, পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্রযুক্ত অষ্টমীতে পূজা, হোম, উপবাস প্রভৃতি, উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রযুক্ত নবমীতে বিবিধ বলিদ্বারা দেবীর পূজা ওশ্রবণানক্ষত্রযুক্ত দশমীতে প্রণাম করিয়া বিসর্জন দিতে হয়। যদি নক্ষত্রযুক্ত না পাওয়া যায় তাহা হইলে ঐ সকল তিথিতেই ঐ সব করণীয়। সপ্তমীর দিন পূর্বাহ্নে নবপত্রিকা প্রবেশ প্রশস্ত। কদলী, দাড়িমী, ধান্য, হরিদ্রা, মানক, কচু, বিল্ব, অশোক ও জয়ন্তীপত্র এই নয়টীর সমাবেশে নবপত্রিকা। নবপত্রিকা স্থাপনের পর মৃন্ময়ী মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়। তারপর নানাবিধ উপচারে পূজা কার্য হইয়া থাকে। অষ্টমী ও নবমীর সন্ধি সময়ে যোগিনীগণের সহিত মহাদেবীর যে পূজা হয় তাহা সন্ধিপূজা। এই সময়ের নাম উমামহেশ্বর তিথি। অষ্টমীর শেষদণ্ডে ও নবমীর প্রথমদণ্ডে পূজা মহাপ্রশস্ত ও ফলদায়ক। তারপর

মী পূজা সমাপনান্তে দশমী তিথিতে চরলগ্নে (যদি সম্ভব হয়) দেবীকে ণাম করিয়া বিসর্জন করিতে হয়। এই দিনেই অপরাজিতা পূজা রিতে হয়। এই বিজয়া দশমী তিথি অতি শুভ ও আনন্দের দিন। ন্দু রাজারা ঐদিনে বিজয়যাত্রা করিতেন। দেবীর বিসর্জনান্তে স্থদ্রাবধারণ করিতে হয় ও তারপর ঘটস্থিত জলদ্বারা যজমানকে ভিষেক করিতে হয়। অভিষেকবারি ও শান্তিবারি ধারণের পর র্গানামজপ ও তৎপরে গুরুজন ও আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগকে প্রণাম ও গ্রমালিঙ্গন সম্ভাষণাদি করিতে হয়।

ইহাই শারদীয়া পূজার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। এই শারদীয়া পূজাই শেষভাবে বাঙ্‌লার হিন্দুগণের প্রধানতম বাৎসরিক উৎসব। এই ৎসব বাঙ্‌লার অতুলনীয় জাতীয় উৎসব। ইহাকে কলিযুগের শ্বমেধ' যজ্ঞ বলা যাইতে পারে। যদিও ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও হা ভিন্নরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, কিন্তু মূর্তি নির্মাণ করিয়া এত হাসমারোহে ইহা কোথাও অনুষ্ঠিত হয় না। অন্যান্য প্রদেশে দুর্গা জা বিভিন্ন নামে প্রচলিত। যথা পশ্চিম ভারত ও নেপালে ইহা বরাত্র' বা 'নবপত্রিকা', কাশ্মীরে 'অম্বাপূজা' গুর্জরে 'হিঙ্গলা' বা দ্রাণী পূজা ইত্যাদি। গবেষণা দ্বারা দেখা যায় বাংলা দেশে অন্ততঃ ক হাজার বৎসর যাবৎ এই পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

বাংলা দেশে সাধারণতঃ কালিকাপুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ ও বী পুরাণের পদ্ধতি অনুযায়ী দুর্গাপূজা হইয়া থাকে। কোন কোন লায় পূজাপদ্ধতির কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, যেমন মৈমনসিংহ জেলায় ৎস্যপুরাণোক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী ও রাজসাহী জেলায় বাণীনাথকৃত র্গাপূজা পদ্ধতি' অনুযায়ী পূজা হইয়া থাকে।

মূর্তিতত্ত্ব—এক্ষণে দুর্গার মূর্তি বিষয়ে সামান্য অবতারণা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন (ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক) 'দুর্গোৎসবতত্ত্ব' ও দুর্গাপূজাতত্ত্ব' নামক ২খানি নিবন্ধগ্রন্থ রচনা করেন। এই দুইখানি গ্রন্থে পূজাপদ্ধতি ও মূর্তিতত্ত্ব বিষয়ে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। বাঙলার দেবীমূর্তি রঘুনন্দনের মূর্তিতত্ত্বের অনুসারেই প্রস্তুত হয়। রঘুনন্দন অবশ্য ভবিষ্যপুরাণ ও কালিকাপুরাণের উপর ভিত্তি করিয়াই এই গ্রন্থদ্বয় রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বেও তদীয় গুরু শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি 'দুর্গোৎসব বিবেক' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। শূলপাণিরও 'দুর্গোৎসব বিবেক' নামক একখানি গ্রন্থ আছে। এই সব গ্রন্থে পরস্পরের মতের সামঞ্জস্য আছে, কিন্তু মিথিলার কবি বিদ্যাপতি 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী' নামক যে গ্রন্থ রচনা করেন উহার মতের সহিত রঘুনন্দনের মতের বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এই বিষয়ে জিকন ও বালক নামক আরও ২জন নিবন্ধকার পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের রচিত গ্রন্থের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ভবদেব ভট্ট নামক বাংলার প্রাচীনতম নিবন্ধকার (ইনি খ্রীস্টীয় ১২শ অব্দের প্রথমে আবির্ভূত রাজা হরিবর্মদেবের সমসাময়িক) তাঁহার প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণে জিকন ও বালকের উল্লেখ করিয়াছেন।

কালিকাপুরাণে দেবীর তিন রকম মূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়—উগ্রচণ্ডা (তখন অষ্টাদশ ভুজা), ভদ্রকালী (তখন ষোড়শ ভুজা) কাত্যায়নী (তখন দশভুজা)। এই তিন মূর্তিই মহিষমর্দিনী-মূর্তি। ঐ পুরাণে দেখা যায় তিনটী সৃষ্টিতে তিনি এই তিনরূপে মহিষাসুরে

করিয়াছিলেন। বাংলাদেশে সাধারণতঃ দশভুজা মূর্তিতেই দেবী
ৃতা হ'ন; কোন কোন বৈষ্ণবপ্রধান স্থানে হরগৌরী মূর্তিও
লিত আছে। এই দশভুজা দেবীর যে রূপ কালিকাপুরাণে
১,২১-২২) আছে তাহা প্রদত্ত হইতেছে ঃ—

দেবীর মস্তকে জটা, অর্ধচন্দ্রের মুকুট, তাঁহার মুখ পূর্ণচন্দ্রসদৃশ
তিনটী চক্ষু; তাঁহার দেহের বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনাভ, তাঁহার দেহ
যৌবনসম্পন্ন ও সর্বাভরণভূষিত এবং তিনি উগ্র ত্রিভঙ্গিমাভাবে
য়মানা। তাঁহার দশহাতে দশপ্রকার আয়ুধ; দক্ষিণদিকের প্রথম হস্তে
শূল, দ্বিতীয় হস্তে খড়্গ, তৃতীয়ে চক্র, চতুর্থে তীক্ষ্ণ বাণ ও পঞ্চমহস্তে
ক্ত; বামদিকের প্রথমে খেটক ও পরে যথাক্রমে ধনুক, পাশ.
শ, ঘণ্টা ও পরশু। দেবীর দক্ষিণপদ সিংহের উপর ও বামপদ
ষাসুরের উপর ও মহিষাসুর ছিন্নশির মহিষের ভিতর হইতে বহির্গত
তেছে। দেবী উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডী,
বতী, চণ্ডরূপা ও অতিচণ্ডা এই আটটী শক্তিতে পরিবৃতা। বর্তমানে
ভমায় আমরা এই অষ্ট শক্তির পরিবর্তে দুই পার্শ্বে বামদিকে
স্বতী ও কার্তিক ও দক্ষিণে লক্ষ্মী ও গণপতি দেখিতে পাই।

আমরা বাংলাদেশে ও বাংলার বাহিরে বহুস্থানে নানাপ্রকার
র নির্মিত দুর্গামূর্তি দেখিতে পাই। ঐ সব মূর্তির বিবরণ এই
ন্ধে দেওয়া সম্ভবপর নহে। অনেক প্রত্নতত্ত্বশালায় এই প্রকার
ক মূর্তি সংরক্ষিত হইয়াছে। আগমশাস্ত্রে নয় প্রকার দুর্গামূর্তির
খ আছে যথা—নীলকণ্ঠী, ক্ষেমঙ্করী, হরসিদ্ধি, রুদ্রাংশদুর্গা, বনদুর্গা,
দুর্গা, জয়দুর্গা, বিন্ধ্যবাসিদুর্গা, রিপুমারীদুর্গা। এই প্রকার প্রত্যেক

মূর্তিতেই বিভিন্নরূপ ও গুণের বিকাশ—যেমন নীলকণ্ঠী দুর্গা ঐশ্বর্য ও সুখদাত্রী এবং তাঁহার ৪টী হস্ত ; ক্ষেমঙ্করীদুর্গা বলবীর্যদাত্রী ; হরসিদ্ধি দুর্গা কাম্যবস্তু প্রদায়িনী ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত দুর্গার আরও অনেক মূর্তি আছে যথা, নন্দা, নবদুর্গা, ভদ্রকালী, মহাকালী, অম্বা, অম্বিকা, মঙ্গলা, সর্বমঙ্গলা, কালরাত্রী, ললিতা, গৌরী, উমা, পার্বতী, রম্ভা, ত্রিপুরা, ভূতমাতা, যোগনিদ্রা, বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী, কালী, রক্তচামুণ্ডা, যোগেশ্বরী, শিবদূতী ইত্যাদি। এইসব বিভিন্ন মূর্তির মধ্যে পার্থক্য আছে। বাহুল্যভয়ে তৎসমুদয় এখানে উল্লিখিত হইল না।

শ্রীশ্রীকালী

সংজ্ঞা—কালঃ (কৃষ্ণবর্ণ) অস্তি অস্যাঃ—কাল + ঙীষ (পা ৪।১।৪২) অর্থাৎ ইঁহার বর্ণ কাল বলিয়া ইঁহার নাম কালী। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ইঁহার বর্ণ কাল নহে, তিনি মহামেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা; ইহা তাঁহার ধ্যানমন্ত্র হইতেই পাওয়া যায়। ইহা পরে আলোচিত হইতেছে।

উৎপত্তি—আদ্যাশক্তি ভগবতীর দুইটি প্রধান মূর্তি—এক দুর্গা, অন্য কালী। কথিত আছে সতী দক্ষযজ্ঞে যাইবার জন্য যখন শিবের অনুমতি পাইলেন না তখন তিনি দশটি ভয়ঙ্করী মূর্তিতে শিবকে ভয় দেখাইবার প্রয়াস করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিনা নিমন্ত্রণে যজ্ঞে যাইবার অনুমতি পান। এই দশ মূর্তির নাম দশমহাবিদ্যা যথা—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে দেখা যায় মহিষাসুরবধের পর দেবীর শরীর হইতে শিবা-অম্বিকা নির্গত হইলেন। এই অম্বিকা ভগবতীর শরীর কোষ হইতে নির্গতা হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইল 'কৌষিকী' এবং তিনি হিমাচলেই অবস্থান করিতে লাগলেন। তারপর শুম্ভ নিশুম্ভের সেনানীদ্বয় চণ্ড ও মুণ্ড যখন বহু সৈন্য পরিবৃত হইয়া দেবীকে ধরিতে অগ্রসর হইলেন তখন ক্রোধে তাঁহার মুখ-মণ্ডল মসীবর্ণ (কৃষ্ণবর্ণ) হয় এবং তাঁহার ললাট হইতে এক দেবী নির্গত হইয়া অসুরদিগকে নিহত করিতে থাকেন।

কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাতিপাশিনী।
বিচিত্র খট্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা॥ ইত্যাদি।

এই দেবীই কালী।

দেবী ভাগবতের ৫ম স্কন্ধে ২৩ অধ্যায়ে দেখা যায় কৌষিকী উৎপত্তির পর দেবী পার্বতীর শরীর কৃষ্ণবর্ণ হইল এবং তিনি কাল-রাত্রি নামে খ্যাতা হইলেন। ইনি দেবী কৌষিকীর পার্শ্বে উপস্থিত থাকিয়া ধুম্রলোচন বধ করিয়াছিলেন ও পরে চণ্ড-মুণ্ডকে বধ করেন। এবং এই জন্য ইঁহার নাম হইল চামুণ্ডা। চণ্ডীতেও 'চামুণ্ডা' শব্দের এই প্রকার উৎপত্তির কথাই আছে; যখন তিনি চণ্ড ও মুণ্ডের মস্তক দুইটি আনিয়া কৌষিকী দেবীকে দেন তখন কৌষিকী তাঁহার নাম 'চামুণ্ডা' রাখেন।

কালিকাপুরাণ (৪০ অধ্যায়) হইতে দেখা যায় দেবীদুর্গার দেহ-ত্যাগের পর যখন তিনি হিমালয়রাজ হিমবানের কন্যারূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন তখন তিনি কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, পরে উর্বশী প্রভৃতি অপ্সরাগণ তাঁহাকে গৌরাঙ্গী করেন। আবার এই পুরাণেই আছে যে শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের জন্য ইন্দ্রাদি দেবতারা হিমালয় পর্বতের গঙ্গাতীর্থে আসিয়া দেবী মহামায়ার স্তব করিতে থাকেন। তখন মহামায়া মাতঙ্গ-স্ত্রীরূপে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন কি নিমিত্ত তাঁহারা মাতঙ্গ আশ্রমে উপস্থিত আছেন। তৎক্ষণাৎ দেবীরই অঙ্গ হইতে অন্য এক দেবীমূর্তি আবির্ভূতা হইয়া উত্তর দেন শুম্ভনিশুম্ভ বধের জন্য দেবতারা স্তব করিতেছেন। এই নব দেবীমূর্তি প্রথমে কৃষ্ণ পরে গৌরবর্ণা হ'ন। এইজন্য ইহার নাম কালিকা। বিভিন্ন পুরাণে

কালীমূর্তির উৎপত্তি বিষয়ে এইসব কাহিনী আছে এবং ইহাদের মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। তবে দৈত্য-বিনাশের জন্য আদ্যাশক্তি মহামায়ার অন্যতমা ভয়ঙ্করী মূর্তিরূপে ইনি আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, ইহা স্থির জানা যায়।

মূর্তি পরিচয়—এই যে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন কালীমূর্তিরূপে দেবীর আবির্ভাব ও এইসব মূর্তির বর্ণনা বা ধ্যানমন্ত্র আছে, সেগুলি হইতেই দেখা যায় বর্তমানে পূজিতা দেবী কালীমূর্তির সহিত ইহাদের সামান্য বিভিন্নতা আছে । দেবতাদের ভয়-নিবারণের জন্য দেবী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য এইসব মূর্তিতে সামান্য পার্থক্য আছে, কিন্তু মূলতঃ সকলেই আদ্যাশক্তির মহাশক্তিবিশেষ। এবং বিভিন্ন কার্যকলাপের জন্য বা মূর্তির জন্য দেবী বিভিন্ন নামে বিখ্যাতা। যেমন দেবতাদিগকে উগ্র ভয় হইতে রক্ষা করেন বলিয়া ইঁহার নাম 'উগ্রতারা'। ইনি যখন আবির্ভূতা হন, তখন মস্তকে একটি জটা ছিল বলিয়া ইঁহার নাম 'একজটা'। তদ্ব্যতীত দক্ষিণাকালী, রক্ষাকালী, শ্মশানকালী, ভদ্রকালী, প্রভৃতি বিভিন্ন নামানুযায়ী ইঁহার মূর্তিরও কিছু ভিন্নতা আছে। তন্ত্রশাস্ত্রের মতে এইসব বিভিন্ন নাম ও মূর্তির তারতম্যের কারণ এই যে উপাসক তাঁহার নিজের গুণ বা সামর্থ্যানুযায়ী যাহাতে উপাসনা-কার্য সহজে করিতে পারেন তজ্জন্য দেবীরও গুণ বা ক্রিয়ানুসারে বিভিন্ন রূপ কল্পনা করেন। মহানির্বাণতন্ত্রে ১৩ উল্লাসেও এই মত ব্যক্ত করা হইয়াছে যথা—

"উপাসকানাং কার্যায় পুরৈব কথিতং প্রিয়ে।

গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকীর্তিতম্ ॥"

বর্তমানের কোন কোন পাশ্চাত্য বা তদ্ভাবাপন্ন পণ্ডিতদের মতে কালীমূর্তি প্রাচীন ভারতের আর্যধর্মাবলম্বীদের সাধনার মূর্তি নহে ; উহা অনার্যদের নিকট হইতে গৃহীত। ইহা যে ভ্রমাত্মক তাহা বলা বাহুল্য ; কারণ প্রাচীন পুরাণাদিতেই, যেমন মার্কণ্ডেয় পুরাণ, দেবী ভাগবত ইত্যাদি, যে কালীমূর্তি ও তাঁহার ধ্যানের বিষয় লিপিবদ্ধ আছে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

উপরে বলা হইয়াছে এই যে কালীর উৎপত্তি ও মূর্তি পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদের সহিত বর্তমানে পূজিতা মূর্তির ঐক্য নাই। ঐসব মূর্তি শিবোপরি অবস্থিতা নহে। বর্তমানে পূজিতা মূর্তির নাম শ্যামা মূর্তি। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতেই এই পূজা প্রচলিত। কালিকাপুরাণে আছে দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিবার পর হিমালয়-রাজের কন্যারূপে তদায় পত্নী মেনকার গর্ভ হইতে বসন্তকালে মৃগশিরানক্ষত্রে নবমীতিথিতে অর্ধরাত্রি সময়ে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। কন্যাকে নীলোৎপলসদৃশবর্ণা দেখিয়া মেনকা নাম রাখেন শ্যামা, হিমালয়রাজ নাম রাখেন কালী এবং বন্ধুবান্ধবেরা নাম রাখিলেন পার্বতী। সুতরাং শ্যামা কৃষ্ণবর্ণা নহে, বর্ণহীন আকাশের দৃশ্যমান বর্ণের ন্যায় নীলাভ এবং শ্যামামূর্তি এইপ্রকার বর্ণযুক্ত হওয়াই প্রয়োজন।

পূজাপদ্ধতি—চতুর্দশীযুক্ত অমাবস্যাতিথিকে উমামহেশ্বর তিথি বলে। কার্তিক মাসে এই প্রকার অমাবস্যা তিথিতে অর্ধরাত্রি সময়ে দেবী পূজা প্রশস্ত। বিশ্বসারতন্ত্রে আছে ঐ তিথিতে অর্ধরাত্র সময়ে

দেবী মহাকালী কোটী যোগিনী পরিবৃতা হইয়া পৃথিবীতলে আবির্ভূতা হইয়াছেন বলিয়া ঐ সময়ে পূজা করিলে সাধক সিদ্ধিলাভ করে। সূর্যাস্তের এক প্রহরের পর ২ঘটিকা কালকে 'মহানিশা' বলে, তার পরবর্তী কালকে 'মহাতিনিশা' বলে। মহানিশায় পশুভাবে পূজা এবং বীর ও দিব্যভাবের পূজা মহাতিনিশায় করিতে হয়। এই তিথি শনি বা মঙ্গল বার যুক্ত হইলে বিশেষ ফলপ্রদ হয়।

বিভিন্ন তন্ত্রে ও পূজাপদ্ধতিমূলক গ্রন্থে পূজার বিশেষ নিয়ম ও মন্ত্রাদি লিপিবদ্ধ আছে, সুতরাং তৎসমুদয়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শ্যামার বীজমন্ত্র "ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণ কালিকে স্বাহা" ইহার অর্থ 'তন্ত্রসার'গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে কথিত আছে। মর্মার্থ এই যে 'ক' জলরূপী মোক্ষদায়ক, 'রেফ' অগ্নিরূপী তেজোময়ী, ইহাদের সহিত 'ঈ' যোগ করিলে তিনি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারিণী ইহা বুঝায়, এবং তৎসহ চন্দ্রবিন্দু নিষ্কল ব্রহ্মস্বরূপ, ইহা প্রতীতি করে; ক্রীং শব্দ মুক্তিপ্রদ। হূং শব্দ জ্ঞানপ্রদ এবং হ্রীং সৃষ্টিস্থিতি বিনাশকারক। এইসব মন্ত্রের সহিত 'দক্ষিণে কালিকে' সম্বোধনে দেবীর সান্নিধ্য জ্ঞাপন করে এবং স্বাহা শব্দ জগতের মাতৃস্বরূপা এই অর্থে প্রযোজ্য।

কার্ত্তিকের এই অমাবস্যা তিথিতে শ্যামা বা দক্ষিণাকালীর পূজা নিত্যপূজা। যাহা না করিলে প্রত্যবায় অর্থাৎ পাপ হয় তাহার নাম নিত্যপূজা বা কর্ম (অকরণে প্রত্যবায় সাধনানি নিত্যানি— বেদান্তসার) অন্য সময়ে পূজার নাম কাম্যপূজা। বিভিন্ন সময়ে ও উদ্দেশ্যে দেবীর এইসব কাম্যপূজা বিভিন্ন নামে প্রচলিত আছে।

(১) রক্ষাকালী পূজা—মারীভয়, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি হইতে

রক্ষার জন্য পূজা। ইহা শনি বা মঙ্গলবার, এবং কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী, নবমী, চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যা তিথিতে এবং নিশামুখে (অর্ধরাত্রে নহে) প্রশস্ত।

(২) ফলহারিণী কালিকা পূজা—জ্যৈষ্ঠমাসের অমাবস্যায় করিতে হয়।

(৩) রটন্তী কালীপূজা—সৌরচান্দ্র মাসের চতুর্দশীকে রটন্তী চতুর্দশী বলে। সুতরাং এই পূজা মাঘে এবং কোন কোন সময়ে পৌষ-মাসেও হয়। ইত্যাদি।

কালিকাপুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, বিশ্বসার তন্ত্র, গুপ্তসাধন তন্ত্র, বিদ্যোৎ-পতিতন্ত্র, মায়াতন্ত্র, কালীতন্ত্র, ভৈরবতন্ত্র, উত্তরকামাখ্যাতন্ত্র, জ্ঞানার্ণব, কালীকুলসর্বস্ব, তন্ত্রসার প্রভৃতি গ্রন্থে এইসব বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

শ্যামাপূজা ব্যতীত শ্যামাযন্ত্র ও কবচধারণ, এবং স্তব ও কবচ পাঠ করিলেও বিপদ দূরীভূত হয়। শনিগ্রহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্যামা। সুতরাং শনিগ্রহ-বৈগুণ্য দূরীভূত করিবার জন্য শ্যামাপূজা ও কবচাদি ধারণে শনি সন্তুষ্ট হ'ন ও গ্রহদোষ দূর হয়।

বিবিধ তথ্য—দাক্ষিণাত্যের তিরুপ্পালত্তুরাই নামক স্থানে ভদ্র-কালীর এক সুন্দর ব্রঞ্জধাতু (bronze) নির্ম্মিত মূর্তি আছে তথায় ইনি ৪ হস্ত বিশিষ্টা। অন্যত্র ইঁহার ১৮ হাত এবং, প্রত্যেক হাতে অক্ষ মালা, ত্রিশূল প্রভৃতি আছে।

মাদেয়ুর এবং মাদ্রাজ প্রত্নশালায় মহাকালীর দুইটী উপবিষ্টমানা (bronze) ধাতু নির্ম্মিত মূর্তি আছে। এই সব কোন মূর্ত্তিতেই কিন্তু শিবমূর্ত্তি নাই।

Hindu Iconography নামক গ্রন্থে কালীর এই কয়টী বিভিন্ন মূর্ত্তির কথা আছে, যথা ভদ্রকালী, মহাকালী, অম্বা, অম্বিকা, মঙ্গলা, সর্বমঙ্গলা, কালরাত্রি, তোটলা, ত্রিপুরা, ভূতমাতা, যোগনিদ্রা, বামা, জ্যেষ্ঠা (মনোন্মানী প্রমুখ ৮টি-মূর্ত্তির মধ্যে প্রথমা বলিয়া), রৌদ্রী, কালবিকর্ণিকা, বালপ্রমথনী, সর্বভূতদমনী, বারুণি চামুণ্ডা, রক্তচামুণ্ডা, শিবদূতী, যোগেশ্বরী, ভৈরবী, ত্রিপুরাভৈরবী, শিবা, প্রভৃতি।

ইলোরাগুহা, দাক্ষিণাত্যের বেলুড় নামক স্থানে এবং কুম্ভকোণে প্রস্তর নির্মিত অতিমনোরম সপ্তমাতৃকা মূর্তি আছে। এই সপ্ত-মাতৃকার নাম যথা—বীরভদ্রা, ব্রহ্মাণি, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী বারাহী, ইন্দ্রানী এবং চামুণ্ডা। এই সব মূর্ত্তির সহিত গণেশেরও একটী করিয়া মূর্তি আছে।

এই প্রাচীন মূর্তিগুলিই পূর্বোল্লিখিত বর্তমান যেসব পণ্ডিতের মত, কালীমূর্তি অনার্যদের নিকট হইতে আর্যরা গ্রহণ করিয়াছে তাহা খণ্ডন করে। বেদের মধ্যেই দেবীসূক্ত ও দেবীর উল্লেখ প্রভৃতি আছে। দাক্ষিণাত্যে জ্যেষ্ঠা দেবীর মূর্তিপূজা প্রচলিত আছে এবং বোধায়ন গৃহ্যসূত্রের একটী অধ্যায়ই এই দেবী পূজাসম্বলিত। এই জ্যেষ্ঠাদেবীরও প্রস্তর মূর্তি মাদ্রাজ প্রত্নশালা, ময়লাপুর, মাদ্রাজ, কুম্ভকোণ প্রভৃতি স্থানে আছে। বিষ্ণুধর্মোত্তর গ্রন্থেও জ্যেষ্ঠা দেবীর ২ প্রকার মূর্তির—রক্তজ্যেষ্ঠা ও নীলজ্যেষ্ঠার বিষয় আছে।

প্রাচীন তামিল নিঘণ্টুতে ইনি মুগদি, তৌবাই, কলদি, মুদেবী, কেট্টাই, একবেণী প্রভৃতি নামে কথিতা।

দার্শনিক তত্ত্ব—দেবী আদ্যাশক্তি কালী বা দুর্গা ব্রহ্মেরই অনন্ত শক্তির মূর্তিমতী প্রতীক। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ (শঙ্করাচার্য প্রমুখ) নির্গুণ ব্রহ্মই পরম তত্ত্ব স্বীকার করেন, তাঁহার শক্তি মায়ার অন্তর্গত বা উহা চরম সত্য নহে, ইহা বলেন। তাঁহাদের মতে ব্রহ্মের সহিত এই শক্তি যুক্ত হইলে তিনি সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এই পদ-বাচ্য হ'ন। কিন্তু অন্যান্য বৈদান্তিক দার্শনিকেরা ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তিকে অভিন্ন বলেন, যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তি অভিন্ন। এই শক্তিবাদ স্বীকার করিলে জড় ও চৈতন্যের যে প্রভেদ এবং যাহার জন্য দ্বৈতবাদ প্রভৃতি দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের স্থান থাকে না। জগতের যাহা কিছু সৃষ্ট পদার্থ সমস্তই শক্তির বিকাশ। বর্তমান বৈজ্ঞানিকেরাও পরমাণুবাদ আর গ্রহণ করেন না। পরমাণু যে জড় নহে পরন্তু অনন্ত শক্তিরই বিকাশ তাহা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই প্রমাণিত হইয়াছে। এই শক্তি মানবের মধ্যে অন্তর্নিহিত। তন্ত্রশাস্ত্রে ও যোগশাস্ত্রে মানবের মধ্যে অন্তর্নিহিত এই অনন্ত শক্তিকে কুণ্ডলিনীশক্তি বলে। ইহার আধার সাধারণতঃ মূলাধারে অর্থাৎ মেরুদণ্ডের নিম্নতম স্তরে, তথায় এই শক্তি আচ্ছন্ন-বৎ আছে। সাধনার দ্বারা এই শক্তি মূলাধার হইতে স্বাধিষ্ঠান—তথা হইতে মণিপুর—তথা হইতে অনাহত (যেখানে ইহা শব্দতত্ত্বে পরিণত হয়) তথা হইতে বিশুদ্ধি—তথা হইতে আজ্ঞা (যেখানে ইহা তেজতত্ত্বে পরিণত হয়) —এবং তথা হইতে সহস্রারে গমন করিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ বা সমাধি হয়। মন্ত্রাদি দ্বারা এইভাবে শক্তি-সাধনা করিলে মানব অনন্ত শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে। দেবীর

বিভিন্ন মূর্তি কল্পনা করিয়া পূজাদি সাধনাও এই শক্তিসাধনা। তিনি বিভিন্ন কার্যের জন্য বিভিন্ন শক্তির প্রতীকরূপে বিভিন্ন সময়ে জগতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। তাঁহারা এই সব আবির্ভাবকাহিনী মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে। তথায় তিনি বিভিন্ন নামে নিজকে পরিচিত করিয়াছেন। তাঁহার তামসগুণাত্মিকা ভয়ঙ্করী মূর্তির নাম মহাকালী।

প্রধানতঃ এই মূর্তিকে অবলম্বন করিয়াই আবার তাঁহার অন্যান্য মূর্তির উদ্ভব হইয়াছে যেমন দশমহাবিদ্যা প্রভৃতি। পরবর্তীকালে ভাস্করেরা বিভিন্ন মন্দিরে এই সব নামানুযায়ী বিভিন্ন মূর্তি নির্মাণ করিয়া তাঁহাদের অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। এইসব মূর্তির পশ্চাতে এক মহাতত্ত্ব রহিয়াছে। শক্তি বর্ণহীনা, সে জন্য তিনি বর্ণহীন আকাশের ন্যায় নীলাভ। তাঁহার পদতলে অনন্তকালরূপী শিব। তাঁহার অসি সর্বধ্বংশকারিণী শক্তিরই পরিচয় দেয়। তাঁহারা ত্রিনয়ন ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালেরই জ্ঞান তথাৎ সর্বজ্ঞত্বের সূচনা করে।

এই মহাশক্তির আরাধনা দ্বারা মানবও মহাশক্তিমান হইতে পারে; তামসিক ভাবে আরাধনা দ্বারা অসুরের ন্যায় শক্তিমান, আবার সাত্ত্বিক ভাবে আরাধনা বা জাগ্রত শক্তিকে চালিত করিলে দেবপদবাচ্য বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী

সংজ্ঞা—জগদ্ধাত্রী শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যিনি জগতকে ধারণ করেন বা পালন করেন (জগতাং ধাত্রী ৬ষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস)। ইহা দেবী দুর্গার নামান্তর।

ইতিহাস—সামবেদীয় তলবকারোপনিষদ্ বা কেনোপনিষদে আছে এক সময় কয়েকজন দেবতা নিজদিগকে ঈশ্বরতুল্য ক্ষমতাপন্ন বিবেচনা করিয়া গর্বিত হইলে আদ্যাশক্তি জগন্মাতা তাঁহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার নিমিত্ত কোটি সূর্য্যসমপ্রভাযুক্ত জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হ'ন! দেবতারা প্রথমে অগ্নিকে বলেন 'অগ্নে, তুমি এই যক্ষ (পূজনীয় অদ্ভুত পদার্থ) কে জিজ্ঞাসা কর। অগ্নি আসিলে দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমি কে?' অগ্নি বলিলেন 'আমি অগ্নি, জাতবেদা নামে প্রসিদ্ধ, এই পৃথিবীতে যত কিছু পদার্থ আছে আমি সমস্তই ভস্মীভূত করিতে পারি'। দেবী তাঁহাকে একটী তৃণ দগ্ধ করিতে দিলেন; অগ্নি তাহা পারিলেন না। এইরূপে বায়ু আসিলে বায়ুও তৃণটী সরাইতে পারিলেন না। তখন ইন্দ্র আসিলে সেই জ্যোতির্ময়ী মূর্তি ইন্দ্রের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইয়া পরে বহু শোভমানা উমা হৈমবতী (হেমাভরণ সম্পন্ন) রূপে আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন 'তোমরা যে অসুর-বিজয় করিয়াছ, তাহা নিজ শক্তিতে নহে, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরই তাঁহার শক্তিতে তোমাদের উপলক্ষ্য করিয়া এই কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারই প্রেরণায় জীব কার্য করিতেছে।"

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে—'উমা হৈমবতী' শব্দের "উমাং বহু শোভমানাং...বিদ্যাম্...অথবা উমৈব হিযবতো দুহিতা হৈমবতী নিত্যমেব সর্ব্বজ্ঞেন ঈশ্বরেণ সহ বর্ত্তত ইতি" এই অর্থ করিয়াছেন। সুতরাং এই দেবী মূর্তি আদ্যাশক্তি মহাদেব-শক্তি হিমাচলসূতা পার্বতী। কাত্যায়নীতন্ত্রেও দেবী জগদ্ধাত্রীর এবম্প্রকার উৎপত্তি বর্ণিত আছে। দুর্গা বিভিন্নরূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন, একবার দক্ষরাজ ন্যাসকতীরূপে, তারপর দেহত্যাগ করিয়া হিমালয়রাজ হিমবান্ ও তৎপত্নী মেনকার কন্যা পার্বতী ও উমা নামে। পার্বতীর সহিত মহাদেবের বিবাহের পর তাঁহারা কৈলাসপর্বতে বিহার করিতেন। সুতরাং দেবীর মর্ত্যধাম কৈলাস।

মূর্তিতত্ত্ব—কাত্যায়নী তন্ত্রের ৭ম পটলে দেবীর যে ধ্যান আছে তাহা হইতে জগদ্ধাত্রীর মূর্তি-পরিচয় পাওয়া যায়—

"সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাম্।
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্॥
শঙ্খচক্রধনুর্বাণ লোচনত্রিতয়ান্বিতাম্॥
নারদাদৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীম্
ত্রিবলীবলয়োপেত নাভিনালমৃণালিনীম্।
রত্নদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে।
প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবগেহিনীম্॥

অর্থাৎ তিনি সিংহের উপর আসীনা, বিবিধ অলঙ্কার শোভিতা, চতুর্ভুজা এবং সর্প তাঁহার যজ্ঞোপবীতরূপে লম্বমান। তাঁহার ৪ হাতে শঙ্খ (বামদিকের উপর হস্তে), চক্র (দক্ষিণ দিকের উপর

হস্তে), ধনু (বামদিকের নিম্নহস্তে) ও বাণ (দক্ষিণ দিকের নিম্নহস্তে), —ত্রিনেত্র, পরিধানে রক্তবস্ত্র এবং দেহের রং প্রভাতকালীন্ সূর্যের ন্যায় রক্তবর্ণ এবং তিনি নারদ প্রভৃতি মুনিগণ দ্বারা স্তুত হইতেছেন।

এদেশের অনেকে জগদ্ধাত্রী দেবীর বর্ণ পীত কয়েন, তাহা ভুল। দেবী দুর্গার শরীরবর্ণ পীত।

পূজাপদ্ধতি ও প্রচলন—মূর্তিনির্ম্মাণ করিয়া দেবী জগদ্ধাত্রীর পূজা প্রচলন কোন্ সময় হইতে হইয়াছে তাহা বলা কঠিন। শুনা যায়, নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একসময় পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করেন—সংক্ষেপে কোন্ পূজা করিলে দুর্গাপূজার ফল পাওয়া যায় এবং পণ্ডিতেরা তাঁহাকে কার্ত্তিকমাসের শুক্লা নবমীতিথিতে জগদ্ধাত্রী পূজা করিতে পরামর্শ দেন। তদবধি মূর্তিনির্ম্মাণদ্বারা এই পূজা বঙ্গদেশে বিশেষ প্রচলিত আছে। বঙ্গদেশের মধ্যে আবার চন্দন-নগরে (কলিকাতা হইতে ২৪ মাইল দূরবর্তী) বিশেষ আড়ম্বর সহ-কারে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

ঠিক যে পদ্ধতিতে শারদীয়া পূজা তিনদিন যাবৎ অনুষ্ঠিত হয়, সেই পদ্ধতি ও মন্ত্রাদিদ্বারা একদিনেই জগদ্ধাত্রী পূজা হয়, তিনদিনের পূজা একদিনেই করিতে হয়। প্রাতের পূজার নাম সাত্ত্বিকী, মধ্যাহ্নের নাম রাজসিকী ও সায়াহ্নের নাম তামসিকী। এই তিনটী পূজা পরের পর করিতে হয়। এবং পরদিন দুর্গাপূজার ন্যায় বিসর্জ্জন দিতে হয়।

কাত্যায়নী তন্ত্র, শক্তিসঙ্গম তন্ত্র, উত্তরকামাখ্যা তন্ত্র, কুব্জিকা

তন্ত্র, ভবিষ্যপুরাণ, দুর্গাকল্প প্রভৃতি গ্রন্থে এই পূজাপদ্ধতি বর্ণিত আছে; সুতরাং এই বিষয়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

যেদিন প্রাতঃকালে নবমীতিথি সেই দিনই পূজা বিধেয় এবং নবমী যদি ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী না হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই; সুতরাং এক্ষেত্রে দশমীতেও বলিদান হইতে পারে।

জগদ্ধাত্রী-যন্ত্রের সামান্য ভিন্নতা আছে—প্রথমে তিনটি ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া ত্রিবিম্ব ও ত্রিকোণযুক্ত অষ্টদল পদ্ম আঁকিতে হয় এবং তারপর যথানিয়মে বজ্র, ভূপুর প্রভৃতি লিখিতে হয়।

দেবী জগদ্ধাত্রীর দার্শনিক তথ্যাদি শ্রীশ্রীদুর্গা প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা

সংজ্ঞা—অন্নং পূর্ণং যয়া (বহুব্রীহি) অর্থাৎ যাঁহার কৃপায় জগৎ অন্নদ্বারা পূর্ণ হয় তিনিই দেবী অন্নপূর্ণা। অন্নপূর্ণা দেবী দুর্গারই একপ্রকার বিশেষ মূর্তি এবং নামান্তর। সুতরাং দুর্গামূর্তির সহিত ইহার সামান্য পার্থক্য আছে। অবশ্য ইহাও বলা প্রয়োজন দেবী দুর্গারও বহুপ্রকার মূর্তি ও তদনুযায়ী নাম আছে।

মূর্তি—অন্নপূর্ণাদেবীর কি প্রকার মূর্তি তাহা নিম্নোক্ত, ধ্যান মন্ত্র হইতেই জানা যায়—

রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়াম্‌-
অন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাম্‌।
নৃত্যন্তমিন্দু সকলাভরণং বিলোক্য
হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীম্‌॥

অর্থাৎ ইনি রক্তবর্ণা, বিচিত্রবসনভূষিতা, ললাটে অর্ধচন্দ্র, অন্নদান-নিরতা, স্তনভারে তাঁহার দেহ নম্র, নৃত্যপরায়ণা, শিবকে (যাঁহার চন্দ্র আভরণ) দেখিয়া হৃষ্টা—সর্বদুঃখহন্ত্রী এই দেবী ভগবতীকে ভজনা করি।

শাস্ত্রাদি হইতে এই দেবীর এইপ্রকার মূর্তি পরিচয় পাওয়া যায়—ইঁহার তিন চক্ষু, মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র সদৃশ, তিনি রত্নখচিত নানালঙ্কার ভূষিতা। সাধারণতঃ তাঁহার দুই হস্ত—বামহস্তে রত্নখচিত একটী পাত্র এবং তন্মধ্যে মধু, ও দক্ষিণ হস্তে একটী চামচ ও তাহাতে অন্ন।

কোন কোন স্থানে তাঁহার ৪ হস্তের বর্ণনাও আছে—এবং সেগুলি পাশ ও অঙ্কুশ যুক্ত এবং অভয় ও বরদমুদ্রাযুক্ত। তাঁহার মস্তকে অর্ধচন্দ্র। ধ্যান মন্ত্রানুযায়ী অন্নপূর্ণা মূর্তির (ইনি উপবিষ্টা) দক্ষিণ পার্শ্বে শিব অন্ন গ্রহণের জন্য হস্তোত্তলন করিয়া দণ্ডায়মান ও বাম পার্শ্বে জয়া বা বিজয়া চামর ব্যজন করিতেছেন। ত্রিবাঙ্কুরে হস্তী দন্তের একটী অতিমনোরম দ্বিভুজা ও দণ্ডায়মানা অন্নপূর্ণা-মূর্তি আছে।

পৌরাণিক কাহিনী—শিব মহাযোগী, সুতরাং জাগতিক কার্যে সম্পূর্ণ উদাসীন। শিবের পুরী কৈলাস পর্বতের উপর। তাঁহাকে অন্নাভাবে অধিকাংশ সময় উপবাস করিয়া থাকিতে হয় এবং সেজন্য পার্বতীর সহিত তাঁহার কলহও হয়। দেবী পার্বতী তাঁহার শক্তি দ্বারা শিবকে স্তম্ভিত করিবার জন্য একদিন কাশীধামে স্বমায়া বিস্তার দ্বারা সকলকে অন্নদান করিতে লাগিলেন। শিব কোথাও ভিক্ষা না পাইয়া শেষে কাশীধামে উপনীত হইয়া দেবীর এই মাহাত্ম্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং দেবীও হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে অন্নদান করিলেন। এই পৌরাণিক কাহিনী যে সাধারণ গৃহস্থের দৈনন্দিন ব্যাপার লইয়া লিপিবদ্ধ তাহা বলা যাইতে পারে। এক সময়ে দেবী কাশীধামে প্রকটিত হইয়া ভক্তদের এই প্রকারে কৃপা করিয়াছিলেন এবং মহাদেবেরও তথায় আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহা বলা যাইতে পারে। চৈত্রমাসের শুক্লা-অষ্টমী তিথিতে দেবীর এই প্রকার আবির্ভাব হইয়াছিল এবং তদবধি ঐ দিবস ভারতের বহুস্থানে মৃন্ময়ী মূর্তি দ্বারা দেবী পূজিতা হ'ন।

অন্যান্য তথ্য—প্রাচীনকালে রোমকেরাও 'অন্নপেরেণা' (সম্ভবতঃ ইহাসংস্কৃত 'অন্নপূর্ণা' শব্দের লাটিন ভাষায় অপভ্রংশ) নামে এক দেবীকে চৈত্রমাসে পূজা করিত। সম্ভবতঃ রোমকেরা ভারত হইতেই এই দেবীর কল্পনা ও পূজা প্রথা গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং অন্নপূর্ণাদেবীর পূজা বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে প্রচলিত ছিল ইহা বলা যাইতে পারে। নূতন শস্য চয়নের পর বসন্তকালে শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে এই দেবীর পূজা স্বাভাবিক। ব্যাবিলনেও 'অন্ন' নামে একদেবীর পূজা হইত। আবার খ্রীষ্টানদের ধর্মশাস্ত্র হইতে জানা যায় যীশুখ্রীষ্টের মাতা মেরীর মাতার নাম অন্ন দেবী (St. Anna)। ইনি বেথলহেমের পুরোহিত মথনের কন্যা। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় এই দেবীর স্মরণার্থ প্রতি বৎসর ২৬ শে জুলাই উৎসব করিয়া থাকেন। কাহারাও আবার ৯ ই ডিসেম্বরও এই উপলক্ষে উৎসব করেন।

দেবী অন্নপূর্ণাকে শস্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী বলা যাইতে পারে। প্রতি-বৎসর শস্য-উৎপন্নের সঙ্গে শস্যদেবীর উপাসনা ও তদুপলক্ষে উৎসব বহুপ্রাচীন জাতির মধ্যেই ছিল। মিশর, নোসস্ (Gnossos—ইহা ক্রীট দ্বীপের এক সমৃদ্ধিশালী রাজ্য) প্রভৃতি স্থানেও শস্যদেবতার পূজা হইত। তারপর যখন রোমক কর্তৃক মিশররাজ্য অধিকৃত হয়, তখন রোমকেরা মিশরীয় দেবতাদের পূজাও নিজদের মধ্যে প্রবর্তিত করেন ব্যাবিলনীয়দের শস্যদেবতার নাম ইষ্টার এবং গ্রীকেরা ইহাদের নিকট হইতে এই পূজা ও উৎসব গ্রহণ করেন। আরও দেখা যায় অধিকাংশ

ক্ষেত্রেই এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইত বসন্তকালে। অন্নপূর্ণা দেবীর পূজাও বসন্তকালে অনুষ্ঠিত হয়।

তবে বর্তমানকালে প্রচলিত মৃন্ময় মূর্তিদ্বারা অন্নপূর্ণাদেবীর পূজা যে সেই প্রাচীন কাল হইতে অব্যাহত ভাবে চলিয়া আসিতেছে তাহা বলা যায় না। কাশীতে প্রতিষ্ঠিত অন্নপূর্ণার মন্দির ও পূজাপ্রচলন শঙ্করাচার্যের পূর্ববর্তী কালেই ছিল, সুতরাং তাহা আনুমানিক ১৬০০ বৎসর পূর্বে তাহা বলা যাইতে পারে।

তত্ত্ব—বৈদিকযুগ হইতেই এই যে শস্যদেবীর স্তুতি ও পরে উপাসনা ও মৃন্ময়ীমূর্তিদ্বারা পূজা প্রচলিত হইয়াছে তাহা জানিতে পারা যায়। বেদের 'দ্যাবা পৃথিবী' পরবর্তী পৌরাণিকযুগের ভূদেবী হইলেন এবং এই ভূদেবীকেই অন্নপূর্ণা বলা যাইতে পারে। বৈদিক-মন্ত্রের অর্থ এই যে দ্যুলোকস্থ আদিত্যের ভজনাদ্বারা জলরাশির সঞ্চার হয় এবং তাহার পতনে পৃথিবী রসবতী বা গর্ভবতী হন ও তাহা হইতে শস্যের উৎপন্ন হয়। এই ভাবে আলোচনা দ্বারা ইহা বলা যাইতে পারে অন্নপূর্ণাদেবীর পূজা বা স্তুতি বীজাকারে বৈদিক সাহিত্যেই আছে।

শস্যশ্যামলা ভারত কৃষি প্রধান। সুতরাং শস্যশ্যামলা দেবী অন্নপূর্ণার পূজা ও ঐ তিথিকে প্রাচীনকালের ন্যায় কৃষি বা শস্যোৎসব-দ্বারা জাতীয় আনন্দের দিবস রূপে প্রতিপালন করা বাঞ্ছনীয়।

শ্রীশ্রীবাসন্তী

বাসন্তী দেবী দুর্গাদেবীরই নামান্তর। বসন্তকালে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহার নাম বাসন্তী পূজা। সুতরাং দুর্গাপূজার যাহা কিছু নিয়ম সমস্তই এই পূজায় প্রযোজ্য। চৈত্রমাসের শুক্লা সপ্তমী হইতে দশমী পর্যন্ত এই পূজা করিতে হয়। শরৎকালের পূজাকে অকালপূজা বলে, কারণ শরৎ ঋতুর সময় দেবগণের রাত্রিকাল এবং সেইজন্য শারদীয়া পূজায় 'বোধন' অর্থাৎ দেবগণের জাগরণ করিতে হয়, কিন্তু বাসন্তী পূজা কালবোধিত পূজা, সেজন্য এই পূজায় 'বোধন' আবশ্যক নাই। শারদীয়া ও বাসন্তী পূজায় এই মাত্র প্রভেদ। এই পূজাতেও শারদীয়া পূজার ন্যায় চণ্ডীপাঠ, ষষ্ঠী-তিথিতে বিল্ববৃক্ষমূলে দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস প্রভৃতি কর্তব্য।

অনেকের মতে রামচন্দ্রই প্রথম শারদীয়া পূজা প্রচলন করেন, কিন্তু তাহা নহে। বৈদিকযুগেও শরৎকালে এই প্রকার যজ্ঞ ও উপাসনা প্রচলিত ছিল (শ্রীশ্রীদুর্গা দ্রষ্টব্য)। এই বাসন্তীপূজাও যে বহুপ্রাচীন তাহা পুরাণাদি হইতে জানা যায়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ (প্রকৃতি খণ্ড, ২অঃ) হইতে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ গোলকধামে রাসমণ্ডলে মধুমাসে দেবী দুর্গার পূজা করিয়াছিলেন। তারপর বিষ্ণু এই সময়ে মধুকৈটভবধের জন্য দুর্গাদেবীর স্তব করেন এবং সেই সময়ে ব্রহ্মা ভগবতী দেবীর পূজা করেন ও তদবধি সর্বত্র এই পূজা প্রচলিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে এই পূজাও বহুপ্রাচীন। বসুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণ

হইতে এই পূজার উৎপত্তি নহে। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ গোলকে (বৃন্দাবনে নহে) এই পূজা প্রচলন করেন।

রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য শরৎকালে দেবীর পূজা বা উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতে এই শারদীয়া পূজা প্রচলিত হয়। সুতরাং শারদীয়া পূজার প্রথম প্রবর্তক সুরথ ও সমাধি, রামচন্দ্র নহে। কিন্তু শারদীয়া পূজা যে প্রকার ব্যাপকভাবে সর্বত্র বিশেষতঃ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়, বাসন্তীপূজা আদৌ সে ভাবে হয় না। ইহার কারণ কি ? সাধারণের ধারণা আছে যে শরৎকালের পূজা রামচন্দ্রের, আর বসন্তকালে রাবণ দেবীপূজা করিয়াছিলেন, সুতরাং ইহা অসুরের প্রবর্তিত পূজা। এই ধারণা যে ভুল তাহা পূর্বের বিবরণী হইতেই জানা যায়। মধুমাসে দেবীর পূজা বহু প্রাচীন কালেই ছিল। একটি কারণ এই যে এই পূজারই অষ্টমীতিথিতে অন্নপূর্ণা দেবীর পূজা হয়। এই দেবীও দুর্গা, সুতরাং একই গৃহে একই দেবীর পৃথক আবাহন ও পূজা যুক্তিযুক্ত নহে। সেজন্য যাঁহারা অন্নপূর্ণা দেবীর পূজা করেন, তাঁহারা আর বাসন্তী পূজার ব্যবস্থা করেন না এবং অন্নপূর্ণা পূজার অনুষ্ঠান অপেক্ষাকৃত ব্যাপকভাবেই হয়। আবার এই পূজারই নবমী তিথিতে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের জন্মোৎসব। অনেকে রামনবমীব্রতানুষ্ঠান করেন এবং ঐ দিনেই অ-বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের 'নূতনখাতা' উৎসব হয়। আর একবার দুর্গাপূজা ব্যাপকভাবে বাৎসরিক উৎসবরূপে অনুষ্ঠিত হওয়ায় দ্বিতীয়বার ব্যয়সাপেক্ষ এই পূজার অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয় না। এই সব কারণেই এই পূজা কম, তবে একেবারে বিরল নহে।

'শ্রীশ্রীদুর্গা'র মধ্যে অন্যান্য তথ্য লিপিবদ্ধ থাকায় এই পূজার তথ্যাদি পুনরায় লিপিবদ্ধ করা হইল না।

শ্রীশ্রীগঙ্গা

সংজ্ঞা—নিঘণ্টুমতে গচ্ছতি-ইতি গম্‌+গন্‌+টাপ্‌ (অর্থাৎ যাহা গমন করে)। উণাদিসূত্র (১।১২২) অনুযায়ী গম্যৎ-যোঃ। গম+গন গম্যতে ব্রহ্মপদমনয়া—(অর্থাৎ যাহার দ্বারা ব্রহ্মপদে গমন করা যায়) ইনি গমনশীলা এবং জলরাশি পবিত্র বলিয়া ইহাতে স্নানে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়—ইহাই গঙ্গাশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। অমরকোষে গঙ্গার পর্যায় লিখিত আছে—

গঙ্গা বিষ্ণুপদী জহ্নুতনয়া সুরনিম্নগা।
ভাগীরথী ত্রিপথগা ত্রিস্রোতা ভীষ্মসূরপি ॥

অর্থাৎ গঙ্গা বিষ্ণুপদী (পুরাণমতে বিষ্ণুপদ হইতে ইনি উদ্ভূতা), জহ্নুতনয়া (পুরাণমতে জহ্নুমুনি কর্তৃক ইনি যোগবলে নিঃশেষিত হন পরে পুনরায় ভগীরথ কর্তৃক ইহার উদ্ধার সাধন হয়, সেজন্য জহ্নুকন্যা নামে পরিচিতা। হিমালয়ের মধ্যে যেখান হইতে গঙ্গাবতরণ হইতেছে সেখানের একটী বৃহৎ গহ্বরের (gorge) নাম জহ্নু, সম্ভবতঃ সেজন্য ইহাকে জহ্নুতনয়া বলা হয়), সুরনিম্নগা (দেবকর্তৃক কোন শাপবশতঃ ইনি পৃথিবীতলে অবতীর্ণা হন), ভাগীরথী (ভগীরথ কর্তৃক তপোবলে মর্ত্যে আনীতা), ত্রিপথগা (তিন বা বহুপথগামিনী), ত্রিস্রোতা (তিন বা বহু স্রোতবিশিষ্টা), ভীষ্মসূ (ভীষ্মজননী)।

বৈদ্যক রাজনির্ঘণ্ট অনুযায়ী উপরিলিখিত নাম ব্যতীত গঙ্গার আরও অনেক সংজ্ঞা আছে, যথা—অর্ঘতীর্থ, তীর্থরাজ, ত্রিদশদীর্ঘিকা, কুমারসূ, সরিদ্বরা, সিদ্ধাপগা, স্বর্গাপগা, স্বরাপগা, স্বাপগা, ঋষিকল্প,

হৈমবতী, স্বর্বাপী, হরশেখরা, সুরাপগা, ধর্মদ্রবী, সুধা, গান্দিনী, রুদ্রশেখরা, নন্দিনী, অলকানন্দা, সিতসিন্ধু, অধ্বগা, উগ্রশেখরা, সিদ্ধসিন্ধু, স্বর্গসরিদ্বরা, মন্দাকিনী, জাহ্নবী, পুণ্যা, সমুদ্রসুভগা, স্বর্ণদী, সুরদীর্ঘিকা, সুরনদী, স্বর্ধুনী, (সুরধনী) জ্যেষ্ঠা, শুভ্রা, শৈলেন্দ্রজা, ভবায়না, ইত্যাদি। প্রত্যেক নামেরই অর্থ আছে এবং এইভাবে আরও বহু সংজ্ঞা রচনা করা যায়, যথা সুরেশ্বরী, ভগবতী, শঙ্করমৌলীনিবাসিনী ইত্যাদি। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে গঙ্গাশব্দের অর্থ গঙ্গানামক পুণ্যানদী ও ঐ নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

উৎপত্তি—ঋগ্বেদ (১০।৭৫।৫), শতপথ ব্রাহ্মণ, কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে গঙ্গার উল্লেখ আছে। বিভিন্ন পুরাণ, উপপুরাণ ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রে গঙ্গার উৎপত্তি-বর্ণনা আছে। এইসব পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে অল্পবিস্তর ভেদ আছে। বাল্মীকি-কৃত রামায়ণের আদিকাণ্ডে (৪২—৪৪ স্বর্গ) গঙ্গার উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে—

গঙ্গা হিমালয়রাজের কন্যা। সুমেরুতনয়া মেনা বা মনোরমার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। দেবগণ কোন কার্যসিদ্ধির জন্য হিমালয়ের নিকট হইতে ইঁহাকে ভিক্ষা করিয়া ল'ন ; তদবধি ইনি ব্রহ্মার কমণ্ডলু মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। পরে কপিল মুনির শাপে যখন সগরবংশ ধ্বংশ হইল, তাঁহাদের সদ্গতির জন্য সগরবংশীয় মহারাজ ভগীরথ মন্ত্রীদের উপর রাজ্যভার দান করিয়া বহুবর্ষ ব্রহ্মার তপস্যা করিয়া গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনয়ন করেন। ধরাতলে পতিত হইবার সময় গঙ্গার বেগ ধারণের জন্য মহাদেবেরও তপস্যা করিতে হয় এবং

মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া গঙ্গাকে স্বীয় জটার মধ্যে ধারণ করেন এবং গঙ্গা পরে ঐ জটা হইতে বিন্দু সরোবরে পতিত হইল। বিন্দু সরোবর হইতে গঙ্গার সাতটী স্রোত বাহির হয়—হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী নামে ৩টী স্রোত পূর্বদিকে, বঙ্কু, সীতা ও সিন্ধু নামক ৩টী স্রোত পশ্চিমদিকে এবং ভগীরথের নামানুযায়ী ভাগীরথী নামক স্রোত দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয় এবং এইস্থানেই সগরতনয়গণ যাঁহারা কপিলাশ্রমের নিকট (বর্তমানের গঙ্গাসাগর, ভস্মীভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা গঙ্গার পবিত্র বারিস্পর্শে উদ্ধার লাভ করিয়া স্বর্গে চলিয়া যান।

দেবীভাগবতে আছে (৯ম স্কন্ধ) বিষ্ণুর ৩টী পত্নী—লক্ষ্মী, সরস্বতী, ও গঙ্গা। একদিন ইঁহাদের মধ্যে কলহ হইলে সরস্বতী ও গঙ্গা প্রত্যেকেই প্রত্যেককে শাপ দিলেন 'তুমি পৃথিবীতলে নদীরূপে অবতীর্ণ হইবে।' পরে বিষ্ণু আসিয়া বলিলেন 'যাও গঙ্গা, তুমি বিশ্বপাবনী সরিদ্রূপে ভারতে অবতীর্ণ হও এবং আজ হইতে কলির পাঁচ হাজার বর্ষ অতীত হইলে গঙ্গা (পদ্মাবতী সমেত) ও সরস্বতী ভারতের সমস্ত তীর্থসহ (কেবল কাশী ও বৃন্দাবন ব্যতীত) পুনরায় বিষ্ণুলোকে আগমন করিবে। ভারতে অবস্থানকালে আমার অংশজাত শান্তনুরাজ তোমার স্বামী হইবে' (দেবী ভাগবত ৯।৮।১০—২১ দ্রষ্টব্য)।

এইসব পৌরাণিক কাহিনী দেবী গঙ্গার ভারতে আগমন এবং তৎসহ গঙ্গানদীর উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও স্থিতি নির্দেশ করিতেছে। কলির শেষে প্রলয়ের পূর্বে যে পৃথিবী জলহীনা (বর্তমান চন্দ্রের ন্যায়)

হইবে বৈজ্ঞানিকেরাও তাহা স্বীকার করিবেন। পৌরাণিক মতে বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে (অক্ষয় তৃতীয়া) ব্রহ্মলোক হইতে গঙ্গার হিমালয়ে অবতরণ এবং জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লাদশমী তিথিতে হস্তানক্ষত্রে মঙ্গলবারে (দশহরা দিবসে) গঙ্গার হিমালয় হইতে ভূমিতে অবতরণ হইয়াছিল (ব্রহ্মপুরাণ দ্রষ্টব্য)। তারপর গঙ্গা সমগ্র উত্তরভারত অতিক্রম করিয়া সাগরসঙ্গমে মিলিতা হইলেন পৌষ সংক্রান্তি দিবসে এবং তাঁহার পুণ্য বারিস্পর্শে ঐ দিন কপিলাশ্রমে (গঙ্গাসাগর) মৃত সগরসন্তানদের উদ্ধার সাধন হয়। সম্ভবতঃ সগরসন্তানেরা ঋষির শাপের জন্য জন্ম পরিগ্রহ করিতে পারেন নাই, প্রেতাত্মারূপে অবস্থান করিতেছিলেন।

এইসব পৌরাণিক কাহিনীর দার্শনিক ব্যাখ্যা কি হইতে পারে? কথিত আছে একসময় নারদ ঋষির কীর্তনে বিষ্ণুর শরীর হইতে পুলকোদ্‌গম হইয়া তাঁহার পদ হইতে করুণাধারা জলবিন্দুরূপে পতিত হইতে থাকে, তাহা ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে রক্ষিত হয়। বিষ্ণু হইতে উদ্ভূত এই বারিবৃন্দ যে সর্বকলুষনাশ করিতে পারে তাহাতে আশ্চর্য কি? ভগীরথের বহুবর্ষ তপস্যায় ঐ বারিবৃন্দ বিষ্ণুলোক হইতে অক্ষয়তৃতীয়ার দিনে হিমালয়ে পতিত হয়। অবশ্য মেঘের মধ্য দিয়াই বারিরূপে পাত হইয়াছিল। ভগীরথের তপস্যাতেই এই পূতবারির অধিষ্ঠাত্রীদেবী গঙ্গা দশহরা তিথিতে মর্ত্যে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বরেই সগরবংশের কলুষনাশ হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণে আছে যে আকাশমণ্ডলে ধ্রুবনক্ষত্রকে অবলম্বন করিয়া অন্যান্য জ্যোতিষ্কমণ্ডল অবস্থান করিতেছে (অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ

শক্তিবলে ঘুরিতেছে) এবং এইসব জ্যোতিষ্কমণ্ডলে অবস্থিত মেঘ-রাজিকে বিষ্ণুর তৃতীয় পদ বলে (ইহা হইতে জানা যায় পৃথিবীর ন্যায় অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রেও মেঘ আছে)। এই তৃতীয় পদ বা মেঘ হইতে বারিবর্ষণ হইয়া গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই মেঘ-রাজি হইতে প্রথম বারিবৃন্দের পতন অক্ষয়তৃতীয়া দিবসে হইয়াছিল। এবং ঐ বারিবৃন্দ ক্রমে ১মাস ৭দিন পরে (অক্ষয়তৃতীয়া হইতে দশহরা তিথি) স্রোতস্বিনী আকারে হিমালয় হইতে ভূমিভাগে প্রবাহিত হইল। এই সত্যকে অবলম্বন করিয়া পল্লবিতভাবে পৌরাণিক কাহিনীর সৃষ্টি হইল। বিষ্ণু বা ঈশ্বর সমগ্র জগতের উপাদান ও নিমিত্ত উভয় কারণই, সেজন্য তাঁহার বিভিন্ন সৃষ্টলোককে বিভিন্ন পাদ কল্পনা করা হইয়াছে। মেঘরাজি যেন একটী পাদ এবং তাহা হইতে বারি-বৃন্দের পতন বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক দৃষ্টিতে কিছুই অযৌক্তিক নহে। হইতে পারে ঋষিরা যোগবলে জানিতে পারিয়াছিলেন যে ঐ দিবসে (অক্ষয়তৃতীয়া) সৃষ্টির বর্ত্তমানকল্পে প্রথম বারিপতন হইয়াছিল এবং তাহাই স্রোতাকারে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়। ভগীরথের তপস্যাবলে গঙ্গার জন্য শুধু সগরবংশ কেন সমগ্র উত্তর ভারতের সন্তানেরা তাহাদের কৃষিকার্য ও প্রাণধারণ করিয়া কোন্ সুদূর অতীত হইতে আজ পর্যন্ত উদ্ধারলাভ করিতেছে। সুতরাং এইসব কাহিনী যে মূলতঃ দৃঢ় সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

হিমালয়ের বহু অঞ্চল রুদ্রদেব বা শিবের বিহার স্থান ও শৈব-ভূমি। সুতরাং হিমালয়ের বিভিন্ন শৃঙ্গ ও পর্বতমালাকে রূপকভাবে শিবের জটাজুট বলা যাইতে পারে। বহু ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী অত্যুচ্চ

পার্বত্যমালা হইতে গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে সেজন্য হিমালয় অঞ্চলে গঙ্গার শতধারা, সপ্তধারা প্রভৃতি কথিত হয়। গঙ্গার অবতরণের সময় মহাদেবের জটাজুট মধ্যে তাঁহার লুক্কায়িত হইয়া যাওয়ার কাহিনী সেজন্য রূপকভাবে ধরিলেও (যাহারা পৌরাণিক বর্ণনার মধ্যে সত্য দেখে না) ভৌগোলিক বিবৃতিরূপে তাহা সত্য বলিয়া গণ্য করিতে পারা যায়।

ভৌগোলিক বিবরণ - গঙ্গার উৎপত্তি স্থানের নাম গঙ্গোত্তরী বা গোমুখী, ইহা অক্ষা° ৩৪ ৫৮' ৪" উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯' ৬' ৩০" পূঃ মধ্যে গাড়োবাল রাজ্যের অন্তর্গত এবং সমুদ্রতল হইতে প্রায় ১৩৮০০ ফিট উচ্চ। এই স্থান চির তুষারাবৃত এবং ইহার বিস্তৃতি প্রায় অর্ধ ক্রোশ। এই স্থান হইতে জলধারা একটী খাত বা গহ্বরে পড়িয়াছে (উহাই গোমুখী) এবং তথা হইতে স্রোতস্বিনী রূপে ৭৭৮ ক্রোশ পরিভ্রমণ করিয়া গঙ্গা বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। হরিদ্বার হইতে উত্তরে বদরিকাশ্রমের পথে দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, বিষ্ণুপ্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থস্থান আছে। প্রথমেই হৃষীকেশ হইতে প্রায় ৬০ মাইল উত্তরে দেবপ্রয়াগ। এই স্থান গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গম স্থল। তারও উত্তরে রুদ্রপ্রয়াগে মন্দাকিনী ও অলকানন্দার সংগমস্থল, তারও উত্তরে কর্ণপ্রয়াগে পিণ্ডারক নদী ও অলকানন্দার সঙ্গম স্থল। সুতরাং দেখা যাইতেছে হিমালয়স্থ অনেক স্রোতস্বিনী তাহাদের জলরাশি বহন করিয়া গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে ও ইহাকে স্ফীত করিয়াছে।

ক্রমে গঙ্গা নিম্নদিকে হরিদ্বার হইতে ক্রমবর্ধমান গতিতে সাগরাভি-

মুখে ধাবমানা হইল। পথে ফরক্কাবাদে রামগঙ্গা ইহার উপনদী রূপে ইহাতে মিলিত হয়। এলাহাবাদে যমুনা ইহাতে মিলিত হইয়া ইহাকে বিশালাকৃতি করে। তারপর বিহারে শোণ, গণ্ডকী, কৌশিকী প্রভৃতি নদী বিভিন্ন দিক হইতে আসিয়া উপনদী রূপে ইহাতে মিলিত হইল। তারপর গৌড়ে আসিয়া গঙ্গার এক প্রধান শাখা পূর্বদিকে চলিয়া যায়, ইহার নাম পদ্মা। [গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী মতে শঙ্খাসুর ভগীরথের রূপ ধরিয়া গঙ্গাকে ঐ দিকে লইয়া গিয়াছিল, পরে ভগীরথ ফিরাইয়া আনিয়া দক্ষিণে লইয়া যায়]। বর্তমানে যে জলধারা পদ্মা হইতে পৃথক হইয়া কলিকাতার উপর দিয়া বহিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে তাহাকে ইংরাজেরা হুগলী নদী বলে। কলিকাতার উপকণ্ঠ কালীঘাট হইতে যে ধারা ২৪ পরগণার বিভিন্ন গ্রামের মধ্য দিয় এক সময়ে প্রবল স্রোতস্বিনীরূপে প্রবাহিত হইয়াছিল উহাই গঙ্গার আদি প্রবাহ, সেজন্য উহাকে আদিগঙ্গা বলে। বর্তমানে উহা ক্ষীণ ও স্থানে স্থানে শুষ্ক। ইংরাজদের সময়ে খিদিরপুর হইতে কতকাংশ, রাজগঞ্জেরও দক্ষিণ পর্যন্ত, কাটিয়া প্রধান জলরাশি ঐ স্থান দিয়া প্রবাহিত করান হয়, সেজন্য বক্রগতিতে গঙ্গার পূর্বপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, উহাই পুনরায় ঘুরিয়া ফলতা নামক স্থানের নিকট এই কাটা প্রবাহের সহিত মিলিত হইয়াছে। সেজন্য খিদিরপুরের নিকট হইতে দক্ষিণে আদিগঙ্গার সঙ্গমস্থল পর্যন্ত কাটা গঙ্গাস্নানের কোন মাহাত্ম্য নাই।

গঙ্গার মোহনা ক্রমেই দূরে সরিয়া চলিয়াছে। প্রাচীনকালে যেখানে সাগর ছিল, আজ তাহা বিস্তীর্ণ জনপদ। মহাভারতের যুগে দেখা

যায় কৌশিকী তীর্থের (গঙ্গা ও কোশি নদীর সংযোগস্থলে) কিয়দ্দূরেই পঞ্চশত নদীযুক্ত গঙ্গাসাগর (বনপর্ব, ১১৩ অঃ)।

কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিনীতেও আছে ললিতাদিত্য গৌড়ে আগমনের সময় ইহার নিকটেই পূর্ব সমুদ্র ছিল (৫ম তরঙ্গ)।

সমগ্র গঙ্গানদী যে ভূভাগ অধিকার করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহার পরিমাণ ৩৯১১০০ বর্গমাইল। গ্রীষ্মকালে গঙ্গার বিস্তার স্থান-বিশেষে অর্ধ মাইল হইতে ২ মাইলেরও অধিক এবং বর্ষাকালে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী। সমুদ্রের মোহনা হইতে হুগলী পর্যন্ত গঙ্গায় জোয়ার ভাটা হয়, তাহার উত্তরে জোয়ারের বেগ লক্ষিত হয় না। চন্দ্রের আকর্ষণের জন্য সমুদ্রের জল স্ফীত হয় এবং সেজন্য গঙ্গা-মধ্যে সমুদ্রের জল প্রবেশ করে ও জোয়ার হয়। প্রত্যহ ২বার জোয়ার ও ২বার ভাটা হয়।

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে যে স্থান হইতে গঙ্গা ও পদ্মা পৃথক হইয়া গিয়াছে সেইস্থান হইতে দক্ষিণের সমস্ত ভূভাগকে গঙ্গার বদ্বীপ বলা হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদের বাংলার অধিকাংশ স্থানই, যাহা বর্তমানে গ্রাম ও নগরে পরিণত হইয়াছে, তাহা একসময়ে গঙ্গার বদ্বীপ ও পূর্বকালে সমুদ্রের অন্তর্গত ছিল।

প্রায় ১০০ বৎসর পূর্বে একবার গাজিপুরের নিকটে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল যে গঙ্গা প্রতিবৎসর সেখানে ৬৩, ৬৮০, ০০০ টন মাটি আনিয়া ফেলে। সুতরাং কিভাবে গঙ্গার দ্বারা নূতন ভূভাগের সৃষ্টি হয়, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। হরিদ্বার হইতে সমুদ্র পর্যন্ত গঙ্গা প্রতিক্রোশে কতখানি করিয়া ক্রমশঃ নিম্ন হইয়াছে তাহাও

পরীক্ষা করা হয়েছে। রাজমহলের নিকটস্থ স্থানে বর্ষাকালে প্রতি-সেকেণ্ডে ১৮০০,০০০ ঘনফিট জল গঙ্গা হইতে নির্গত হইয়া থাকে।

গঙ্গা হইতে ইংরাজশাসনের সময় অনেকগুলি খাল কাটা হইয়াছে ঐ খালগুলিকে ২ শ্রেণীতে ভাগকরা হয়েছে—উত্তর ও দক্ষিণ। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী প্রদেশ যাহাকে অন্তর্বেদী বা দোয়াব বলে তাহার পূর্বদিকের খালগুলি উত্তর খাল ও তাহার নিম্নের খালগুলি দক্ষিণ খাল।

গঙ্গা-মাহাত্ম্য—গঙ্গার তীরে যত তীর্থস্থান আছে, পৃথিবীর কোন নদীতটে তাহা নাই। গঙ্গা হইতে কাটা খাল, গঙ্গার উপনদী ও শাখা নদী সমগ্র উত্তর ভারতকে উর্বরা ও শস্যশামলা করিয়াছে। গঙ্গার শীতল জলরাজি শরীর ও মনকে স্নিগ্ধ ও পূত করে। তদ্ব্যতীত গঙ্গা নদীর সহিত নদীর অধিষ্ঠাত্রী গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব ও কাহিনী ওত-প্রোতভাবে জড়িত, এমত অবস্থায় গঙ্গার মাহাত্ম্য আর্যধর্মাবলম্বী প্রায় প্রত্যেক মানবের মনকেই যে সম্মোহিত করিবে তাহা বিচিত্র নহে।

মহাভারতে ও অন্যান্য পুরাণাদি গ্রন্থে গঙ্গাস্নানাদির মাহাত্ম্য এবং তিথি বিশেষে গঙ্গাস্নানের বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। উহাদের বিস্তারিত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শ্রবণানক্ষত্র যুক্ত দ্বাদশী, পুষ্যানক্ষত্র যুক্ত অষ্টমী ও আদ্রানক্ষত্র যুক্ত চতুর্দশী তিথিতে; বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসের পূর্ণিমায়; কৃষ্ণপক্ষের ৮মী তিথি, মাঘের অমাবস্যা, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ; ব্যতীপাতযোগ ও পূজাপর্বাহাদিতে গঙ্গাস্নান বিশেষ প্রশস্ত। গঙ্গাক্ষেত্রে (গঙ্গাতীর হইতে ২ ক্রোশ পর্যন্ত স্থান)

দান ও ধর্ম কর্ম বিশেষ প্রশস্ত। গঙ্গাতীরে (গঙ্গার গর্ভ হইতে ১৫০ হাত পর্যন্ত স্থান) কাহারও দান গ্রহণ করা উচিত নয়।

মূর্তি—দেবী গঙ্গার যে মূর্তি ঋষিমনে প্রতিভাত হয়েছিল তাহা পীতবর্ণা, চারি হস্ত বিশিষ্টা এবং মকরোপরি আসীনা বা দণ্ডায়মানা। দেবী দুর্গার মূর্তির অনুরূপ।

কোন্ অনাদিকাল হইতে দেবীগঙ্গা মূর্তিমতী নদীরূপে করুণার ধারায় ভারতকে প্লাবিত করে আস্‌ছেন, কত অগণিত তীর্থ, কত জনপদ তাঁহার তটভূমিতে রচনা করেছেন—কত সাধুমহাত্মার স্তববন্দনা গীতির সহিত কলকলনাদমিশ্রিত করিয়া ভক্তমনে অপূর্ব আনন্দধারা বর্ষণ করে আস্‌ছেন। তাঁহার পীযুষধারায় ভারতের নরনারী জীবিত হয়ে আছে—এই গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনার অতীত। জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিক দিয়া বিচার করিলেও সহস্র সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া ভারতবাসী গঙ্গার নিকট চিরঋণী। সুতরাং গঙ্গার শ্রেষ্ঠত্ব ভারতের অন্যান্য সমস্ত নদী অপেক্ষা যে বেশী তাহা সকলেরই স্বীকার্য।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব

স্থান—উড়িষ্যা প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্বস্থানে সমুদ্রতীরে অবস্থিত তীর্থক্ষেত্রের নাম পুরী (ইহার অক্ষাং ১৯° ৪৮′ ১৭″ উঃ ও দ্রাঘী ৮৫° ৫১′ ৩৯″ পূঃ)। এইস্থানের অন্যনাম নীলাচল, পুরুষোত্তম, শ্রীক্ষেত্র, শঙ্খক্ষেত্র প্রভৃতি। এইস্থানে ভগবান দারুব্রহ্ম বা শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে যে চারিটী ধাম বা প্রধান তীর্থস্থান আছে—বদরিকাশ্রম (হিমালয়ের উপরে), দ্বারকা, রামেশ্বর ও পুরী—তন্মধ্যে এই পুরীধামেই কোনপ্রকার জাতিবিচার নাই এবং ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলেই একত্রে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করে।

গ্রন্থ—নিম্নলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থে জগন্নাথদেবের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে—ব্রহ্মপুরাণ, নারদপুরাণ, বরাহপুরাণ, প্রভাসখণ্ড, স্কন্দপুরাণের উৎকল খণ্ড; কূর্ম, পদ্ম ও ভবিষ্য পুরাণান্তর্গত পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য, কপিলসংহিতা, নীলাদ্রিমহোদয়, পুরাণসর্বস্ব, বিষ্ণুরহস্য, মুক্তিচিন্তামণি, রঘুনন্দনকৃত পুরুষোত্তমক্ষেত্রতত্ত্ব, পুরুষোত্তমপুরাণ, আগমকল্পতরু, পুরীমাহাত্ম্য ইত্যাদি। উৎকল ভাষায় লিখিত গ্রন্থের মধ্যে মাগুনিয়া দাস ও শিশুরাম দাস রচিত ক্ষেত্রপুরাণ ও দারুব্রহ্ম, এবং মহাদেব দাসকৃত নীলাদ্রিমহোদয় প্রসিদ্ধ। বাংলাভাষায় কবি মুকুন্দরামকৃত জগন্নাথমঙ্গল ও পুরুষোত্তমচন্দ্রিকা গ্রন্থ প্রধান। এতদ্ব্যতীত তৈলঙ্গ ও অন্যান্য ভাষাতেও জগন্নাথদেব বিষয়ক গ্রন্থাদি আছে।

উৎপত্তি—বিভিন্ন পুরাণে জগন্নাথদেবের উৎপত্তি-কাহিনীর মধ্যে

।মান্য প্রভেদ আছে। তবে মূলতঃ প্রায়ই সমান। নারদ পুরাণের ত্তরভাগের ৫২ অধ্যায়ে যে বিবরণী আছে তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইতেছে। একদিন সুমেরু পর্বতে লক্ষ্মী নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন কি প্রকারে মানব মুক্তিলাভ করিতে পারে। তদুত্তরে নারায়ণ বলিলেন —"পুরুষোমক্ষেত্রে কল্পস্থায়ী বটবৃক্ষের নিকটে এক ইন্দ্রনীলময়ী কেশব প্রতিমা মৎকর্তৃক নির্মিত হইয়াছে। উহার দর্শন ও পূজায় মানব মুক্তিলাভ করে। যখন ক্রমে সকলেই মুক্তিলাভ করিতে লাগিল তখন যমরাজের স্তবস্তুতিতে (কারণ সকলেরই মুক্তি হ'লে যমের কাজ বন্ধ হয়) আমার ঐ মূর্তি গোপন করিলাম।" পরে সত্যযুগে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন (ইনি মালব প্রদেশের রাজা ছিলেন) ঐ পুরুষো-ত্তমক্ষেত্রে আগমন করিয়া তথায় বিষ্ণুর স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু কর্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হইলেন—"নিশাবসানে সাগর তীরের জলস্থলে এক মহাবৃক্ষ দেখিবে। একাকী পরশু হস্তে লইয়া ঐ বৃক্ষ ছেদনকরতঃ উহা হইতে আমার দারুমূর্তি নির্মাণ কর।" রাজা তাহাই করিলেন এবং ব্রাহ্মণরূপী বিষ্ণু সে সময় বিশ্বকর্মার সহিত তথায় আবির্ভূত হইলেন। বিষ্ণুর আদেশে মানববেশী বিশ্বকর্মা ইন্দ্রদ্যুম্নের নির্দেশ মত ৩টী মূর্তি নির্মাণ করিলেন—(ক) পদ্মপত্রায়তন, শঙ্খচক্র গদাধর কৃষ্ণ মূর্তি (খ) গৌরবর্ণ লাঙ্গলাস্ত্রধারী অনন্তদেব (বলরাম), (গ) রুক্সবর্ণ বাসুদেব ভগিনী সুভদ্রা। বিষ্ণুর আদেশে আষাঢ়ের শুক্লাপঞ্চমীর দিন হইতে সাতদিন যাবৎ মহোৎসব করিয়া রাজা ঐ মূর্তিত্রয় স্থাপন করিলেন।

ব্রহ্ম পুরাণেও এই প্রকার কাহিনী আছে। স্কন্দপুরাণে উৎকল-

খণ্ডে, কপিলসংহিতায় ও মাগুনিয়া দাস রচিত উৎকল ভাষার গ্রন্থাদিতে যে প্রকার আখ্যান আছে তাহাও সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। অবন্তীনগরের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁহার পুরোহিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যাপতিকে পুরুষোত্তমক্ষেত্রস্থিত নীলকান্তমণি নির্মিত ভগবানের নীলমাধব মূর্তি আছে কি না তাহা স্থির করিতে উৎকলে পাঠান। বিদ্যাপতি তথায় আসিয়া বিশ্বাবসু নামে এক শবরের গৃহে আশ্রয় লইল। এই শবরের ললিতা নামে এক কন্যা ছিল। বিশ্বাবসুর অনুরোধে ও রোষে বিদ্যাপতি এই কন্যাকে বিবাহ করিল পরে জানিল এই শবরেরই পূর্বপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে তীর দ্বারা বিদ্ধ করে। কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে রামাবতারে বালিরাজকে নিহত করিয়াছিলেন এবং সেই কারণেই এই বিশ্বাবসু শবরের পিতা যিনি পূর্বজন্মে বালিপুত্র অঙ্গদ ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণকে অজ্ঞাতসারে মৃগকর্ণ ভ্রমে তারবিদ্ধ করে। পরে শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মৃত দেহ যখন অগ্নিতে দগ্ধ হইল না তখন আকাশবাণী হইল "এই মৃতদেহ সাগরের জলে ফেলিয়া দাও। কলিযুগে নীলাচলে দারুব্রহ্মরূপে ইহা পূজিত হইবে"। তদনুযায়ী পাণ্ডবগণ কৃষ্ণদেহ সাগরে ফেলিয়া দিলেন। যাহা হউক এই শবরকন্যার নির্বন্ধাতিশয়ে বিদ্যাপতি শবর কর্তৃক নীলমাধব মূর্তি দেখিতে পাইল। তারপরেই ঐ মূর্তি অন্তর্হিত হইলেন।

বিদ্যাপতি পরে দেশে গিয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে সংবাদ দিলেন। রাজা পরে জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে পুষ্যানক্ষত্রে সদলবলে পুরুষোত্তমক্ষেত্রোভিমুখে যাত্রা করিলেন ও তথায় আসিয়া নীলকণ্ঠের পূজা করিলেন। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে স্বাতী নক্ষত্রে

নৃসিংহদেবের প্রতিষ্ঠা করিলেন ও শত অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী হইলেন। (তিনি যেস্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর)। পরে স্বপ্নাদেশ মত ভগবানের দারু (নিম্বকাষ্ঠ নির্মিত) মূর্তি স্থাপন করেন। মূর্তিগুলি কেন এবম্প্রকার হইল, যাহা কোন দেবদেবীর মূর্তির অনুরূপ নয়, তাহাও বর্ণিত আছে। রাজা বহু সূত্রধর নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু কেহই রাজা কর্তৃক আনীত নিম্ববৃক্ষ ছেদন করিয়া মূর্তি নির্মাণ করিতে পারিল না। তখন স্বয়ং ভগবান্ এক কদাকার বৃদ্ধ সূত্রধরবেশে রাজার নিকট আসেন এবং বলেন যে তিনি ২১ দিন মন্দির দরজা বন্ধ করিয়া মূর্তি নির্ম্মাণ করিবেন এবং কেহ যেন সে সময় মন্দিরদ্বার না খোলে। তদনুযায়ী মন্দিরদ্বার রুদ্ধ হইল। রাজার গুণ্ডিচা নামে এক পাটরাণী ছিলেন; তিনি রাজাকে বলিলেন যখন এত সূত্রধর আসিয়াও কোন কিছু করিতে পারিল না, তখন ঐ বৃদ্ধ সূত্রধর বাস্তবিকই কিছু করিতেছে বা মন্দিরের মধ্যে মৃত হইয়াছে (কারণ কোন নির্ম্মাণ শব্দই পাওয়া যাইতেছে না) তাহা দেখা প্রয়োজন। রাজাও ইহাতে সম্মতি দিলে ১৫ দিন পরে যখন মন্দির দ্বার খোলা হইল তখন দেখা গেল যে মূর্তিগুলি অর্ধসমাপ্ত হইয়াছে, হস্ত পদ নির্ম্মিত হয় নাই। মন্দির হইতে সূত্রধরও অন্তর্হিত হইয়াছেন। রাজা তখন বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে স্বপ্নাদেশে জগন্নাথ কর্তৃক আদিষ্ট হইলেন যে—তিনি এই মূর্তিতেই বিরাজ করিবেন; সোণা দিয়া তাঁহার হাত গড়াইয়া দেওয়া হউক; যে শবর বনে তাঁহার নীলমাধব মূর্তি পূজা করিত তাহারই পুত্র পশুপালক দৈত্যপতি ও তাহার বংশধরেরা মন্দিরের পূজারী হইবে এবং বলভদ্র গোত্রজ

'সুয়ার গণ' মন্দিরের রন্ধন কার্যে নিযুক্ত হইবে; সকলে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে এই জগন্নাথের মহাপ্রসাদ একত্রে গ্রহণ করিবে।

রাজা এই আদেশে হৃষ্টচিত্ত হইয়া তদনুযায়ী কার্য করিলেন।

ইহাই সংক্ষেপে জগন্নাথদেবের উৎপত্তির পৌরাণিক কাহিনী।

বর্তমান ঐতিহাসিকদের মতবাদ

ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের—যেমন ডঃ রাজেন্দ্র লাল মিত্র, স্যর আলেক্‌জাণ্ডার কানিংহাম, ফার্গুসন, হণ্টার, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ—মতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের রূপান্তর। বৌদ্ধদিগের দন্তোৎসবই পুরীর রথযাত্রা। ইত্যাদি।

ইঁহাদের বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপে বলা হইতেছে—

বৌদ্ধগ্রন্থ দাথবংশ (১২ শ খ্রীঃ অঃ রচিত) হইতে দেখা যায় বুদ্ধের নির্বাণের পর তাঁহার শিষ্য ক্ষেম কলিঙ্গ (উড়িষ্যা) দেশের রাজা ব্রহ্মদত্তকে বুদ্ধের দন্ত প্রদান করেন, তিনি তাহা নিজ রাজধানী দন্তপুরে প্রতিষ্ঠিত করেন ও প্রতিবৎসর ঐ দন্ত মহোৎসব হয় এবং তাহাই বর্তমানে জগন্নাথদেবের রথ যাত্রায় পরিণত হইয়াছে। ব্রহ্মদত্তের সময় হইতে উড়িষ্যা ও নিকটবর্তী অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য হয় এবং তাহারই অনেক নিদর্শন বর্তমানে উদয়গিরি, খণ্ডগিরি প্রভৃতি স্থানে রহিয়াছে।

হাণ্টার প্রভৃতির মতে পুরীধামেরই প্রাচীন নাম দন্তপুর, কিন্তু ডঃ রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয় বলেন মেদিনীপুর জেলার দাঁতন নামক স্থানই দন্তপুর।

অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার 'উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে (২য় খণ্ড, উপক্রমণিকা) এইসব পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের মতই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন জেনারেল কানিংহাম সাঞ্চী, উজ্জয়িনী প্রভৃতি স্থান হইতে যে সব বৌদ্ধ ধর্মযন্ত্র সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বায়ু, অগ্নি, মৃত্তিকা, জল ও আকাশ ইহাদের বীজ-স্বরূপ য র ল ব ন এই পাঁচটী অক্ষরের পালি লিপির সমষ্টি স্বরূপ এবং ঐ ধর্মযন্ত্রের সহিত জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তির সাদৃশ্য আছে। পুরীর এই মূর্তিত্রয়ের সহিত হিন্দুধর্মের কোন দেবদেবীর মূর্তির কোনই সাদৃশ্য নাই। চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউ এন্‌থ সাং এর বর্ণনায় চরিত্রপুর নামক বন্দরই বর্তমান পুরী। এখানে ৫টী বৌদ্ধ স্তূপে বুদ্ধের অস্থি কেশাদি ছিল এবং তাহার একটী স্তূপ বর্তমানের জগন্নাথ মন্দির। ইহা দ্বাদশ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত। জগন্নাথের বিগ্রহের মধ্যে যে বিষ্ণুর পঞ্জরের বিষয় প্রবাদ আছে তাহা বুদ্ধেরই অস্থি। এই পঞ্জরপ্রবাদ এবং জাতিবর্ণ প্রথা ত্যাগ উভয়ই হিন্দুধর্মের বিরোধী। সুতরাং পুরীক্ষেত্র ১২শ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগ হইতে, যে সময় বৌদ্ধধর্ম এই অঞ্চল হইতে ক্রমশঃ অন্তর্হিত হয়, ক্রমে হিন্দুদের জগন্নাথক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই সব মতবাদের বিস্তারিত আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা বিশেষরূপে জানিতে চান তাঁহারা নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাঠ করিতে পারেন—

(১) উপাসক সম্প্রদায়, ২য় ভাগ—অক্ষয়কুমার দত্ত

(২) Dr. R L. Mitter's Antiquities of Orissa, Vol 2

(৩) Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol XIX

(৪) Dr. Hunter's Orissa, Vol I

(৫) Cunningham's Archaeological Survey Reports, Vol XVIII ; ইত্যাদি।

এইসব প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বা ঐতিহাসিকগণের মত যে সমীচীন নহে তাহার আমরা কয়েকটী প্রমাণ দেখাইতেছি—

(ক) ঋগ্বেদে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং বিষ্ণু বৈদিক এবং আর্যদেবতা। এই ঋগ্বেদের শাংখায়ন ব্রাহ্মণে আছে—

আদৌ যদ্দারুপ্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপূরুষম্

তদা লভস্ব দুর্দনো তেন, যাহি পরং স্থলম্

অর্থাৎ আদিকাল হইতে বিপ্রকৃষ্টদেশে (উৎকল) যে অপৌরুষেয় দারুমূর্তি সমুদ্রতীরে ভাসিয়া আসিয়াছিল তাহার পূজা করিলে মানব পরমপদ প্রাপ্ত হয়।

সুতরাং এই দারুব্রহ্ম মূর্তির উপাসনা বৈদিক কাল হইতেই প্রচলিত।

(খ) মহাভারতের বনপর্ব (১১৪।২২-২৭ শ্লোক) হইতে দেখা যায় যে পাণ্ডবেরা যখন পুরীতে আগমন করেন তখনও তাঁহারা (জগন্নাথের) মহাবেদী দর্শন করিয়া স্তব করিয়াছিলেন। বর্তমানেও জগন্নাথের অপেক্ষা এই মহাবেদীর মাহাত্ম্য অধিক। উৎকল খণ্ডেও (৩৩।১৪ অঃ দ্রষ্টব্য) রথযাত্রাকে মহাবেদী-উৎসব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রহ্মপুরাণ ও নারদপুরাণ হইতে দেখা যায় যে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন যখন পুরীতে আসেন তিনি এই বেদীই দর্শন করিয়াছিলেন, কারণ

পুরুষোত্তম তখন সমুদ্রের বল্লীমধ্যে গুপ্ত হইয়াছেন। এই বেদীতেই তিনি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে মহাভারত যুগে শাংখায়নব্রাহ্মণ বর্ণিত দারুমূর্তি বেদীতে না থাকিলেও বেদী বর্তমান ছিল।

ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিশ্বামিত্রবংশধর শবর জাতির উল্লেখ দেখা যায়। ইহারা উড়িষ্যা ও দক্ষিণ কোশলে (মধ্য প্রদেশ) পরিব্যাপ্ত ছিল। এই শবর জাতি বহু প্রাচীন কাল হইতেই দারুনির্মিত পুরুষোত্তমের পূজা করিত। পরে উত্তর ভারত হইতে আগত আর্যদিগের সহিত ইহাদের সংমিশ্রণ হয় এবং আর্যকুলোদ্ভব রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এই তীর্থক্ষেত্রে আসিয়া প্রথমে যজ্ঞ ও পরে জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ ও মূর্তি স্থাপন করেন।

(গ) যদি জগন্নাথক্ষেত্র পূর্বে বৌদ্ধতীর্থ থাকিত তাহা হইলে পুরাণাদি জাতীয় কোন সংস্কৃতগ্রন্থে বা বৌদ্ধ গ্রন্থে ইহার উল্লেখ থাকিত, কিন্তু আধুনিক গবেষণা ব্যতীত ইহার কোন দৃঢ় ভিত্তিই নাই।

(ঘ) জগন্নাথের রথযাত্রাকে বুদ্ধের দন্তোৎসব বা ঐ জাতীয় রথোৎসবের অনুকরণ বলা হইয়াছে, কিন্তু বৌদ্ধ রথোৎসবের বহু পূর্ব হইতেই জৈন তীর্থঙ্করদের, পার্শ্বনাথ প্রভৃতির, রথযাত্রা বা শোভাযাত্রা প্রচলিত আছে। রথযাত্রা যে শুধু জগন্নাথদেবেরই নহে, পরন্তু সনাতন ধর্মের অন্যান্য দেবদেবীরও রথযাত্রা আছে তাহা শাস্ত্রাদিতেই পাওয়া যায় (এই গ্রন্থের রথযাত্রা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

(ঙ) জাতিবর্ণনির্বিশেষে মহাপ্রসাদ-ভক্ষণ বৌদ্ধ-আচারের অনুকরণ নহে। ইহা বহু পরবর্তীকালে প্রচলিত প্রথা। সেজন্য

মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে কোন কথাই কোন পুরাণে লিপিবদ্ধ নাই। কি ভাবে এই প্রথা প্রচলিত হইল তাহা পরে বলা হইতেছে। তারপর দারুব্রহ্ম মধ্যে বিষ্ণুপঞ্জর ইহা একটী প্রবাদ মাত্র। কোন পুরাণাদি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের দেহ আগুনে পোড়াইতে না পারায় তাহা পাণ্ডবগণ কর্তৃক সমুদ্রে বিসর্জন করা হইল এবং উহাই পরে পুরীতে দারুব্রহ্মে রূপান্তরিত হইল—মাগুনিয়া দাস কৃত আধুনিক গ্রন্থে এই দুইটী বিষয়কে অবলম্বন করিয়া জগন্নাথে বিষ্ণু পঞ্জরের প্রবাদের উৎপত্তি। সুতরাং এই দুইটি বিষয়কে অবলম্বন করিয়া জগন্নাথ ক্ষেত্রকে বৌদ্ধক্ষেত্র বলা আদে যৌক্তিকতার পরিচয় নহে।

(চ) বর্তমান জগন্নাথ মূর্তি কেন হিন্দু দেব দেবীর মূর্তিজ্ঞাপক নহে তাহার অন্য কারণ আছে এবং পরে লিপিবদ্ধ হইতেছে। ইহা যে বৌদ্ধযন্ত্রের অনুকরণ নহে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

এই প্রকার বহু প্রমাণ দেখাইতে পারা যায় যদ্বারা বর্তমানের ঐতিহাসিকগণের ধারণা যে ভ্রান্ত তাহা নির্ধারিত করা যায়।

বর্ত্তমান ইতিহাস—পূর্বে জগন্নাথদেবের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে বর্তমান মন্দির ও মূর্তি এবং মহাপ্রসাদ ভক্ষণ প্রথার ইতিহাস সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইতেছে।

নানা শিলালিপি ও তাম্রশাসন, যাহা বর্তমানে দুর্গা (রায়পুরের নিকট), কপালেশ্বর (কটক জেলায় মহানদী তীরস্থ এক প্রাচীন গ্রাম) প্রভৃতি স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে—হইতে জানা যায় যে শবররাজগণের মহানদী তীরস্থ রাজিমনগরে রাজধানী ছিল।

এখানে ইঁহারা বহু বিষ্ণুমন্দির স্থাপন করেন এবং এক জগন্নাথ মন্দিরও বর্তমানে বিদ্যমান আছে। শবররাজ শিবগুপ্ত খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এখানে রাজত্ব করিতেন। তিনি যবনের ভয়ে পুরী মন্দির হইতে জগন্নাথের মূর্তি আনিয়া এই রাজিমনগর জগন্নাথ-মন্দিরে উহা স্থাপন করেন। এই যবন কাহারা? ইহারা যে গ্রীক নহে তাহা নিশ্চিত, কারণ এত প্রাচীন সময়ে গ্রীকেরা ভারতে আসে নাই। যবদ্বীপের অধিবাসীদের যবন্ বা জবন্ বলা হইত। খ্রীস্টীয় ৮ম-৯ম শতাব্দীতে (শিবগুপ্তের রাজত্ব কালে) ইহারা অতিশয় পরাক্রান্ত ও দুর্দান্ত হইয়া কাম্বোজ ও ভারতের পূর্ব উপকূলের নানাস্থানে সমুদ্র পথে আসিয়া লুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তি করিত। ইহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এবং সম্ভবতঃ ইহাদের ভয়েই রাজা শিবগুপ্ত পুরী হইতে জগন্নাথদেবের মূর্তি তাঁহার রাজধানী রাজিমনগরে স্থানান্তরিত করেন।

বর্তমানে আবিষ্কৃত শিলালিপি প্রভৃতি হইতে দেখা যায় এই শিবগুপ্তের পুত্র মহারাজ ভবগুপ্ত বা মহাভব গুপ্ত ত্রিকলিঙ্গের অধিপতি ছিলেন। ব্রহ্মেশ্বরলিপি হইতে (২ শ্লোক) জানা যায় এই ভবগুপ্তের সময় চন্দ্রবংশীয় রাজা জনমেজয় (কোন তাম্রশাসনে ইনি সোমবংশীয় বলিয়া কথিত (J. A. S. B. Vol 7. ৫৫৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য; কিন্তু চন্দ্রের অন্য নাম সোম) তৈলঙ্গ হইতে আসিয়া ওড্ররাজকে পরাজিত করিয়া ভবগুপ্তের অধীনে উৎকলের রাজা হন। এই জনমেজয়ের পুত্র মহারাজ যযাতি। ইঁহার তাম্রশাসন হইতে দেখা যায় ইনি ভবগুপ্তের পুত্র মহারাজাধিরাজ ত্রিকলিঙ্গাধিপতি মহাশিবগুপ্তের

অধীনে উৎকলরাজ্যাধীশ ছিলেন। এই মহারাজ যযাতি খ্রীস্টীয় ৯ম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হ'ন। ইনিই শবর রাজধানী হইতে জগন্নাথ মূর্তি আনাইয়া বা ঐ প্রকার মূর্তি তৈয়ারী করাইয়া পুরীতে পুনঃস্থাপন করেন। এই উপলক্ষ্যে বিশিষ্ট বৈদিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনয়ন করেন ও যাগযজ্ঞ করেন। ইনি বর্তমান যুগে এই মন্দির ও মূর্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য ২য় ইন্দ্রদ্যুম্ন (পৌরাণিক রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের নামানুযায়ী) উপাধিলাভ করেন (Sterling's Orissa দ্রষ্টব্য)। চীন পরিব্রাজক হিউ-এন্থ্-সাং খ্রীস্টীয় ৭ম শতাব্দীতে সমুদ্র তীরবর্তী চরিত্রপুরে (ইহা পুরীর প্রাচীন নাম) যে ৫টী মন্দিরের উচ্চ চূড়া দর্শন করিয়াছিলেন সেগুলিকে কানিংহাম্ সাহেব প্রমুখ পণ্ডিতেরা বৌদ্ধ স্তূপ বলিয়া ধারণা করিয়াছেন, কিন্তু এই ধারণা যে ভুল তাহা চীন ভাষাবিদ্ Beal সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন (তৎকৃত Records of the Western Countries Vol. II, পৃঃ ২০৬ দ্রষ্টব্য)। ঐ মন্দিরগুলিকেই মহারাজ যযাতি সংস্কার বা পুনর্নির্মাণ করেন। মহারাজ যযাতি শবর রাজেরই অধীনস্থ রাজা ছিলেন। তদ্ব্যতীত এই শবরেরাই প্রাচীন বৈদিক কাল ও পৌরাণিক কাল হইতে দারু ব্রহ্মের পূজা করিয়া আসিতেছেন, সেজন্য পুরীতে রাজা যযাতি কর্তৃক মন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হইলেও এই শবরদিগের আধিপত্য তিনি ক্ষুণ্ণ করিতে পারিলেন না। তাহাদিগের প্রথা-অনুযায়ী তিনি ভোগ ব্যবস্থা ও জাতিবর্ণ নির্বিশেষে একত্র মহাপ্রসাদ গ্রহণ, পূজাব্যবস্থা ও বিগ্রহের লেপসংস্কার ব্যবস্থা করিলেন। এই শবরদিগকেও উপনয়ন সংস্কার দিয়া আর্যজাতিভুক্ত করিলেন। ইহারা আজ পর্যন্ত দৈত্যপতি

ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত ও পূজারী। অনার্যদিগকে আর্যেরা দৈত্য বা অসুর বলিত, সেই জন্যই সম্ভবতঃ শবরেরা দৈত্যপতি বা দৈত্যাপতি নামে খ্যাত। সুতরাং দেখা যাইতেছে একত্রে এই মহাপ্রসাদ গ্রহণ বৌদ্ধদিগের প্রথার অনুকরণ নহে।

মহারাজ যযাতির পিতা রাজা জনমেজয় হইতে এই বংশের মোট ৮ জন রাজা উৎকল রাজ্যের সিংহাসনারূঢ় ছিলেন। তারপর খ্রীস্টীয় ১১শ শতাব্দীতে গাঙ্গেয়রাজ মহাবীর চোড়গঙ্গ উৎকলরাজ্য অধিকার করেন। ২য় নরসিংহের তাম্রশাসনের ২৬—২৭ শ্লোক হইতে দেখা যায় এই রাজা চোড়গঙ্গই পুরীর বর্তমান জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ করেন। ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী কেদারেশ্বরের দ্বারের শিলালিপি হইতে দেখা যায় ১০০৪ শকে চোড়গঙ্গের রাজত্বকালে ঐ মন্দির (কেদারেশ্বর) নির্মিত হয়। সুতরাং ঐ সময়ের কিছু পূর্বে বা পরে জগন্নাথমন্দির নির্মিত হইয়াছে। এই মহারাজ চোড়গঙ্গই জগন্নাথমন্দিরের প্রত্যেক দিনের কার্যবিবরণী তালপাতায় লিখিবার প্রথা প্রচলন করেন। ইহা আজও হইতেছে এবং এইগুলিকে 'মাদলাপঞ্জী' বলে। পরবর্তী কালে মুসলমানদের ও কালাপাহাড় প্রভৃতির আক্রমণফলে ঐ মাদলাপঞ্জীর অনেকাংশ নষ্ট হইয়া যায় এবং পরে আবার কোন কোন অংশ পুনর্লিখিত হয়, সুতরাং এই মাদলাপঞ্জী হইতে সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক সত্য নির্ধারণ করা যায় না।

উড়িষ্যার কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে মহারাজ অনঙ্গভীম কর্তৃক পরমহংস বাজপেয়ীর তত্ত্বাবধানে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে

১১৯৬ খ্রীঃ অব্দে জগন্নাথ মন্দির নির্মিত হয়। কিন্তু গাঙ্গবংশীয় এইসব রাজাদের যে সব শিলালিপি বা তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে এবিষয়ের কোন উল্লেখ নাই। হইতে পারে মহারাজ অনঙ্গভীমদেব ঐ সময় ঐ মন্দিরের অন্যান্য বহিরংশ নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই গাঙ্গবংশীয় রাজাদের সময়ে জগন্নাথ মন্দিরের আয় বহুল পরিমাণে বর্ধিত হয়। ইঁহারা জগন্নাথদেবের বিশেষ সেবক ছিলেন এবং নিজদিগকে জগন্নাথের 'ঝাড়ুদার' বলিয়া পরিচয় দিতেন। অদ্যাবধি রথযাত্রার সময় পুরীর রাজা জগন্নাথ-দেবের রথে উঠিবার পূর্বে পথ ঝাঁট্ দিয়া থাকেন।

গাঙ্গবংশীয় রাজাদের প্রতাপ নষ্ট হইলে কর্ণাট হইতে সূর্যবংশীয় রাজা কপিলেন্দ্রদেব উড়িষ্যা জয় করেন। ইনি ও ইঁহার মন্ত্রী প্রভৃতি সকলেই পরম বৈষ্ণব ছিলেন। কর্ণাটদেবের পুত্র পুরুষোত্তমদেব মন্দিরের চূড়ায় বর্তমান নীলচক্র প্রদান করেন। জগন্নাথদেবের মন্দির চূড়ায় নীলচক্র রাখিবার প্রথা প্রাচীন কাল হইতেই ছিল এবং তাহার বিষয় ব্রহ্মপুরাণ, নারদপুরাণ প্রভৃতিতেও লিপিবদ্ধ আছে। পুরুষোত্তমদেবের পুত্র প্রতাপরুদ্রদেব ১৫০৩ খ্রীঃ অব্দে রাজা হইলেন। ইঁহার সময়েই শ্রীচৈতন্যদেব পুরীধামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং অনেক নূতন উৎসব প্রচলন করিলেন। পুরীর শ্রী বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল এবং মহাপ্রসাদ ভক্ষণের প্রথাও বিশেষভাবে প্রচলিত হইল।

প্রতাপরুদ্রদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ও সামন্তগণের মধ্যে কলহ হয়, বিভিন্ন সামন্তবংশধরেরা রাজা হ'ন, এবং রাজা মুকুন্দ-

দেবের সময় ধর্মদ্বেষী কালাপাহাড় উৎকল আক্রমণ করে ও বহু মন্দিরাদি ধ্বংশ করে। যাজপুরে মুকুন্দদেব তাহাকে বাধা দিতে গিয়া নিহত হইলেন। জগন্নাথের সেবকগণ মহামন্দিরের দারু মূর্তিগুলি চিল্কা হ্রদের নিকটস্থ পারিকুদে আনিয়া এক গর্তমধ্যে লুকাইয়া রাখেন। কালাপাহাড় যখন মন্দিরে মূর্তি দেখিতে পাইল না, তখন চর পাঠাইয়া এই স্থান হইতে মূর্তি বাহির করিল ও তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিল। মাদলাপঞ্জী হইতে দেখা যায় যেইমাত্র কালাপাহাড় এই দারুব্রহ্মে অগ্নি দিল তাহার সর্বাঙ্গ খসিয়া গেল ও সে মৃত্যুলাভ করিল। তাহার সঙ্গীরা দগ্ধ দারুব্রহ্ম-মূর্তিকে পরে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করে। জগন্নাথদেবের এক ভক্ত, নাম বেসর মহান্তি, ইহা দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনিই মূর্তিগুলি গঙ্গা হইতে উদ্ধার করিয়া উড়িষ্যার কুজঙ্গ দুর্গাধিপতি খণ্ডাইতের নিকট লুকাইয়া রাখেন। ইহার ২০ বর্ষ পরে রাজা রামচন্দ্রদেবের রাজত্বকালে ঐ মূর্তি পুনরায় কুজঙ্গ হইতে পুরীতে আনীত হইল। ইহার পরেও পুনরায় পাঠানদের অত্যাচারে জগন্নাথদেবকে কয়েকবার চিল্কাহ্রদের নিকট লুক্কায়িত রাখা হইয়াছিল। তারপর মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে উড়িষ্যার কয়েকজন সামন্ত একত্রে দনাই বিদ্যাধরের পুত্র রণাই রাওত্রাকে রামচন্দ্রদেব নাম দিয়া উড়িষ্যার সিংহাসনাভিষিক্ত করেন। এই রাজা রামচন্দ্রদেব শাস্ত্রীয় বিধানানুযায়ী নিম্বকাষ্ঠের দারুব্রহ্ম পুনর্নিমাণ করিয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৫৯২ খ্রীঃ অব্দে রাজা মানসিংহ উড়িষ্যায় আসিয়া রামচন্দ্রদেবকে মহারাজ উপাধি দেন ও উড়িষ্যার অন্তর্গত

১২৯ কেল্লার শাসনভার প্রদান করেন। ইঁহারই বংশধরেরা বর্তমানে পুরীর ঠাকুররাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং ইঁহারা খোর্দারাজ বলিয়া বিখ্যাত।

ইহার পরেও বাদসাহ আওরঙ্গজেব জগন্নাথ মন্দির ধ্বংস করিবার জন্য নবাব ইক্‌রাম খাঁকে আদেশ দেন। সে সময় মহারাজ রাম-চন্দ্রদেবের বংশধর রাজা দ্রব্যসিংহদেব এখানকার রাজা। তিনি কৌশলক্রমে মন্দিরের সিংহদ্বারে রক্ষিত একটী রাক্ষসমূর্তি ও দুইটী তোরণ ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং আওরঙ্গজেবকে এক চন্দন কাষ্ঠের মূর্তি ও জগন্নাথদেবের নেত্রে রক্ষিত ২টী প্রধান হীরক পাঠাইয়া দেন। এইভাবে মন্দির ও মূর্তি রক্ষিত হইল। তারপর ১৮০৪ খ্রীঃ অব্দে ইংরেজেরা পুরীরাজের সমস্ত ভূভাগ অধিকার করিল ও কিছুকাল মন্দির তত্ত্বাবধান করিল। পরে খ্রীস্টানপাদরীদের নির্দেশমত দেবসেবার উপযোগী কিছু সম্পত্তি দিয়া মন্দিরের তত্ত্বাবধান পুরীরাজের হাতে ছাড়িয়া দিল। তদবধি এই পুরীরাজই মন্দিরের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক।

কিছুকাল পূর্বে কংগ্রেস মন্ত্রীদের সময় পুরী মন্দিরের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার জন্য একটী আইন প্রস্তুত হয়। ইহাই সংক্ষেপে জগন্নাথ-ক্ষেত্রের ইতিহাস।

তীর্থক্ষেত্র—ঋষিকুল্যা নদী হইতে বৈতরণী নদী পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগকেই তীর্থক্ষেত্র বলে; তার মধ্যে মহানদীর দক্ষিণ ও সমুদ্রের উত্তরকূল পর্যন্ত দশ যোজনের মধ্যে কয়েকটী স্থানের মাহাত্ম্য অধিকতর। ইহার মধ্যে আবার যেস্থান স্পর্শ করিয়া সমুদ্র তীর্থরাজ

বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে সেই তিনক্রোশ বিস্তৃত শঙ্খাকারযুক্ত স্থান যাহা ভগবান্ নিজ মূর্তির অনুরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই স্থান পুরুষোত্তমক্ষেত্র বা নীলাচল বা পুরী। এই মহাতীর্থ সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ এবং এই দারুব্রহ্ম জগন্নাথদেব সকল দেবতার রাজা—

সর্বেষাং চৈব ক্ষেত্রানাং রাজা শ্রীপুরুষোত্তমম্।
সর্বেষাঞ্চৈব দেবানাং রাজা শ্রীপুরুষোত্তমঃ॥

(কপিল সংহিতা, ৫।৩৯)

বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত এই তীর্থক্ষেত্র সনাতন বৈদিক ধর্মাবলম্বীদের অতি পুণ্যময় স্থান। ইহা যে বৌদ্ধক্ষেত্র নহে, ইহার উৎসবাদি যে বৌদ্ধ উৎসবাদির অনুকরণ নহে, এই দারুব্রহ্ম মূর্তি যে বৌদ্ধযন্ত্রের বিকৃত পরিণতি নহে. তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এই স্থানের মাহাত্ম্য চৈতন্যভাগবতের অন্তখণ্ডে প্রাঞ্জলভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

মুর্ত্তিপরিচয়—পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে সত্যযুগে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন (ইহার নাম মৈত্রী উপনিষদে উল্লিখিত আছে) যখন পুরীক্ষেত্রে আসেন, তখন তিনি দারুব্রহ্ম মূর্তি দেখিতে পান নাই, বেদী মাত্র দেখিয়াছিলেন। পূর্বের মূর্তি যাহা শবররাজেরা পূজা করিতেন তাহা সমুদ্রবল্লীমধ্যে লুপ্ত। তিনি যে মূর্তিগুলি নির্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিলেন তাহার বর্ণনা উৎকলখণ্ডে (১৯ অঃ) আছে। তাহা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুমূর্তি। ' তারপর যখন পাণ্ডবেরা আগমন করেন তখন সে মূর্তি নাই, তাঁহারাও কেবল বেদী দেখিলেন। আধুনিক সময়ে রচিত মাগুনিয়া দাস ও শিশুরাম দাস রচিত গ্রন্থে দেখা যায় রাজা

ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ যযাতি (ইনি ২য় ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে পরিচিত) ২১ দিনের পূর্বেই অর্থাৎ ১৫ দিন গত হইলে মন্দির দরজা খোলায়, যে ছদ্মবেশধারী সূত্রধর মূর্তি গঠন করিতেছিলেন তিনি অন্তর্হিত হ'ন ও অর্ধসমাপ্ত মূর্তিই ভগবানের আদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা হইতে মনে হয় পরবর্তীযুগে মহারাজ যযতি কর্তৃক যখন মূর্তি নির্মিত হইয়াছিল, তখন কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হওয়ায় মূর্তি-নির্মাণ অসমাপ্ত থাকিয়া যায়, কিন্তু ভগবানের আদেশে উহাই প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তদবধি যতবার নবকলেবর-নির্মাণ হইয়াছে তাহা ঐ মূর্তি-ত্রয়ানুযায়ীই হইয়াছে, আর এই মূর্তির পশ্চাতে দার্শনিক তত্ত্বও নিহিত রহিয়াছে।

নারদপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, উৎকলখণ্ড এবং কপিল সংহিতায় জগন্নাথ ও বলরামের চতুর্ভুজ মূর্তির কথাও বর্ণিত আছে। বর্তমানে ভুবনেশ্বরে অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরের ভিতরে যে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি আছে, এই সব গ্রন্থাদির বর্ণনার সহিত তাহা কতকটা মিলে; সম্ভবতঃ পুরীর মূর্তিও পূর্বে এই প্রকার ছিল। তারপর কোন কারণে, হইতে পারে কালাপাহাড় প্রমুখ দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক মূর্তি অঙ্গহীন বা কতক দগ্ধ হইবার পর যে প্রকার মূর্তি অবশিষ্ট ছিল তদনুযায়ী বর্তমান মূর্তির নবকলেবর নির্মিত হয়। রামচন্দ্র দেবের সময় একবার নবকলেবর হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ সেই সময় হইতেই এই মূর্তির প্রচলন হইয়া আসিতেছে।

দার্শনিক তত্ত্ব—ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, সেজন্য তাঁহার মূর্তি হস্তপদবিহীন বা দুইটি হস্ত গুপ্ত ও দুইটি হস্ত অভয় বরপ্রদানের জন্য উত্তোলিত।

তিনি সাক্ষীস্বরূপ, দ্রষ্টাস্বরূপ, সেজন্য তাঁর চক্ষুদ্বয় পদ্মপত্রের ন্যায় আয়তলোচন। তিনি বর্ণহীন, সেজন্য আকাশের ন্যায় নীলবর্ণ। তিনি জগতের সৃষ্টিকর্তা—উপাদান ও নিমিত্ত উভয় কারণই, তাহা কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মে সম্ভব নয়, সেজন্য শক্তিস্বরূপিণী লক্ষ্মী বা সুভদ্রার রূপ কল্পনা। এই শক্তির সহিত ব্রহ্ম বা চৈতন্য যুক্ত হইয়া তিনি হইলেন ঈশ্বর বা বলরাম, যিনি সপ্তফণা বেষ্টিত হইয়া চতুর্দশ ভুবন ধারণ করিয়া আছেন।

উৎকলখণ্ডমতে সুভদ্রাই লক্ষ্মী। ঈশ্বর ও তাঁহার শক্তি (যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি) অভিন্ন। এই লক্ষ্মীই দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ সহ্য করিতে পারিবেন না বলিয়া রোহিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, সেইজন্য সুভদ্রা বা বলভদ্রাকে বলদেবের ভগিনী বলা হয়।

ভগবান্ বিভিন্ন মূর্তিতে আবির্ভূত হ'ন। তিনি মানবাকৃতির দ্যোতক কোন মূর্তিতে প্রকাশিত নাও হইতে পারেন। নীলাদ্রি মহোদয় ৪র্থ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি ৭টী দারুময়ী মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—জনার্দন, বলদেব, ভদ্রা, সুদর্শন, বিশ্বধাত্রী, লক্ষ্মী ও মাধব। ইহা তাঁহারই বিভিন্ন বিভূতির বিভিন্ন প্রকাশ। হইতে পারে কোন সময়ে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে এই প্রকার মূর্তিগুলিই ছিল। উৎকলখণ্ড ও কপিলসংহিতায় ভগবানের চারি প্রকার মূর্তিতে আবির্ভাবের কথা আছে, ইহাও এক সময়ে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে থাকিতে পারে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন প্রকার মূর্তিতে পুরুষোত্তম এই ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মনে হয় বর্তমান মূর্তিও

মহারাজ যযাতির (২য় ইন্দ্রদ্যুম্ন) বহু পূর্ব হইতেই প্রচলিত আছে ; ইনি তাহারই পুনর্নিমাণ করিয়াছেন।

মন্দির পরিচয়—জগন্নাথের বর্তমান মন্দির ২২ফিট উচ্চ ভূভাগের উপর অক্ষাং ১৯°৪৮′ ১৭″ উ এবং ৮৫°৫১′৩৯″ পূঃ স্থলে অবস্থিত। এই মন্দির প্রাঙ্গন দৈর্ঘ্যে পূর্ব-পশ্চিমে ৬৬৫ ফিট ও প্রস্থে উত্তর-দক্ষিণে ৬৪৪ ফিট এবং ইহার চারিদিক ২৪ ফিট উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত। এই প্রাচীরের নাম মেঘনাদ এবং রাজা পুরুষোত্তমদেবের সময় ইহা নির্মিত হয়। এই প্রাচীরের ৪টী দ্বার—পূর্বে সিংহদ্বার, পশ্চিমে খাঞ্জাদ্বার, উত্তরে হস্তিদ্বার, ও দক্ষিণে অশ্বদ্বার।

জগন্নাথের মন্দিরটীও ৪ ভাগে বিভক্ত—মূল মন্দির, মোহন, নাটমন্দির, ভোগমণ্ডপ। ভোগ মণ্ডপেরও ৪টী প্রবেশদ্বার। (ক) মূলমন্দির—মহারাজ চোড়গঙ্গ কর্তৃক ইহা নির্মিত। ইহার চূড়া ১৯২ ফিট উচ্চ এবং ইহা ৯০ ফিট উচ্চ ভূমির উপর নির্মিত। ইহার ভিতরেই রত্নবেদী ; ইহা প্রস্তরে নির্মিত এবং দৈর্ঘ্যে ১৬ ফিট ও ঊর্ধ্বে ৪ফিট। কথিত আছে ইহার মধ্যে ১ লক্ষ শালগ্রাম শিলা আছে। এই স্থানটি অন্ধকার, মাত্র ২টি প্রদীপ জ্বলিতেছে। দর্শকেরা বেদীর সামনে দাঁড়াইয়া কর্পূরালোকে দেবদর্শন করে। এই রত্নবেদীর দক্ষিণে বলরাম, তারপর সুভদ্রা, জগন্নাথ ও তৎপরে সুদর্শন মূর্তি। সম্মুখে স্বর্ণনির্মিত লক্ষ্মী মূর্তি, রৌপ্যনির্মিত বিশ্বধাত্রীমূর্তি, ও পিত্তল নির্মিত মাধবমূর্তি।

(খ) মোহন বা জগমোহন—ইহা ৮০ফিট উচ্চ ভূভাগের উপর অবস্থিত এবং ইহার ছাদ ১২০ ফিট উচ্চ।

(গ) নাটমন্দির—ইহাও দৈর্ঘ্য-প্রস্থে প্রায় ৮০ ফিট করিয়া, ইহারও ৪টি দ্বার আছে।

এই সব মন্দিরের গাত্রে যথেষ্ট কারুকার্য ও শিল্পকলার নিদর্শন রহিয়াছে। কুরুচিরও পরিচয় অনেক পাওয়া যায়। যাহার এই প্রকার কুরুচিমূলক চিত্রদর্শনেও মনোবিকার হয় না, সেই জগন্নাথদেব-দর্শনের উপযুক্ত; ইহাই কথিত হইয়া থাকে। মন্দিরের প্রাঙ্গনের ভিতর বহুপ্রকার দেবদেবীর মূর্তি আছে। তাহাদের পরিচয় এখানে নিষ্প্রয়োজন।

মন্দিরের অভ্যন্তরে বটবৃক্ষ আছে, ইহাকে কল্পবৃক্ষ বলে এব এখানে বটেশ্বর লিঙ্গ আছেন। এই মহামন্দিরক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন অষ্ট শক্তি যথা—

বটমূলে মঙ্গলা, পশ্চিমে বিমলা, তারপর সর্বমঙ্গলা, অর্ধাশনী, লম্বা, কালরাত্রি, চণ্ডীরূপা, ও মরীচিকা। এই সমস্ত শক্তির মধ্যে বিমলাই প্রধানা এবং তাঁহার মন্দিরও প্রাচীন; সেজন্য পুরীকে বিমলাক্ষেত্র বলা হয় এবং জগন্নাথকে বিমলার ভৈরব বলা হয়। এই বিমলার মন্দির সম্মুখে আশ্বিনের মহাষ্টমী তিথিতে অর্ধরাত্রি পরে জগন্নাথের শয়নের পর ছাগবলি হয়। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বলি হয় না।

মন্দির প্রাঙ্গনের অগ্নিকোণে বদরীনারায়ণ, তারপর রাধাকৃষ্ণ মূর্তি, ক্রমে মার্কণ্ডেয়েশ্বর, ইন্দ্রাণী, সূর্যমূর্তি, ক্ষেত্রপাল, নরসিংহ মূর্তি, গণেশ, ভূষণ্ডীকাকের মূর্তি, ভাণ্ডগণেশ, গোপীনাথ, মাখমচোরা, সরস্বতী ও নীলমাধবের মূর্তি আছে। তারপর লক্ষ্মীদেবীর মন্দির। ইহাও

জগন্নাথদেবের মন্দিরের ন্যায় ৪ ভাগে বিভক্ত—মূল, মোহন, নাট ও ভোগ। মহারাজ চোড়গঙ্গ কর্তৃক এই মন্দির নির্মিত হয়। এই প্রকার বহু মন্দির এই বিস্তৃত প্রাঙ্গনের চারিপার্শ্বে আছে। মন্দিরের সামনে বর্তমানে যে অরুণস্তম্ভ আছে তাহা মারাঠাগণ কর্তৃক কণারক হইতে আনীত হইয়াছিল।

পূজা—মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রথমে অক্ষয়বট ও গরুড়কে নমস্কার করিয়া রত্নবেদিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিতে হয়, তৎপরে প্রথমে বলরাম, তারপর দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে জগন্নাথ, তারপর মূলমন্ত্রে সুভদ্রাকে পূজা করিতে হয়।

দৈনন্দিন পূজা—প্রথমে জাগরণ, এই সময় দুন্দুভিনাদ, তারপর ক্রমে মঙ্গলারতি, দন্তকাষ্ঠ প্রদান, বস্ত্র পরিধান, বালভোগ, সকাল ভোগ, দ্বিপ্রহর ভোগ হয় ও তারপর দরজাবন্ধ হয়। তারপর অপরাহ্ন ৪টার সময় নিদ্রাভঙ্গের পর জিলাপি ভোগ, ক্রমে সন্ধ্যাভোগ ও রাত্রে বড় শৃঙ্গার ভোগ হয়। সকল ভোগের পূর্বে পূজা ও পরে আরত্রিক হয়। দ্বিপ্রহর ভোগের পর ও রাত্রের ভোগের পর দেবদাসী নৃত্য হয়। প্রত্যেক দিন বিভিন্ন পূজার সময়ে মূর্তির বিভিন্ন বেশ বা শৃঙ্গার হয়, যেমন মঙ্গলারতির সময় মঙ্গল শৃঙ্গার, তারপর অবকাশ, তারপর প্রহর, সন্ধ্যায় চন্দন, রাত্রে বড় শৃঙ্গার। অন্যান্য বেশও মাঝে মাঝে হয়।

উৎসবাদি—উৎসবগুলির বিস্তারিত বিবরণ এই প্রবন্ধে সম্ভব নহে, কেবল মাত্র তাহাদের নামোল্লেখ করা হইতেছে—

(১) চন্দন যাত্রা—বৈশাখের অক্ষয় তৃতীয়া হইতে ২২দিন যাবৎ

মহাসমারোহে জগন্নাথের ভোগমূর্তি মদনমোহনকে প্রত্যহ বৈকালে নরেন্দ্র সরোবরে লইয়া গিয়া নৌকাবিহার করান হয়।

(২) প্রতিষ্ঠা উৎসব—বৈশাখের শুক্লা অষ্টমী। ঐদিন ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্তৃক জগন্নাথদেব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

(৩) রুক্মিণীহরণ—বৈশাখ শুক্লা একাদশী।

(৪) স্নানযাত্রা—জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা। ইহার পর হইতে রথযাত্রা পর্যন্ত জগন্নাথদেবের কেহ দর্শন পায় না। এই সময়ে মন্দিরাভ্যন্তরে বিগ্রহের যে সব কাজকর্ম হয় তাহার 'নীলাদ্রিমহোদয়ে' বিস্তৃতভাবে বর্ণনা আছে।

(৫) রথযাত্রা—আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি। ইহার ৭দিন পরেই পুনর্যাত্রা। ইহার বিস্তারিত বর্ণনা পৃথক প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইতেছে।

(৬) শয়ন একাদশী—আষাঢ়ের শুক্লা একাদশী।

(৭) ঝুলনযাত্রা—শ্রাবণের শুক্লা একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত।

(৮) জন্মাষ্টমী—গৌণ ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী।

(৯) পার্শ্ব একাদশী—ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশী।

(১০) উত্থান একাদশী—কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশী।

(১১) রাসযাত্রা—কার্ত্তিকী পূর্ণিমা।

(১২) প্রাবরণোৎসব—অগ্রহায়ণের শুক্লা ষষ্ঠী। এইদিন দেবতাদের শীতবস্ত্র পরিধান করান হয়।

(১৩) অভিষেকোৎসব—পৌষী পূর্ণিমা।

(১৪) মকরোৎসব—মকর সংক্রান্তি দিবস।

(১৫) গুণ্ডিচা উৎসব—মাঘী শুক্লা পঞ্চমী বা চৈত্র শুক্লাষ্টমী।

(১৬) মাঘী পূর্ণিমা উৎসব।

(১৭) দোলযাত্রা—ফাল্গুনী পূর্ণিমা।

(১৮) রামনবমী—চৈত্রী শুক্লানবমী।

(১৯) দমনকভঞ্জিকা—চৈত্র শুক্লা চতুর্দশী।

(২০) নবকলেবর উৎসব—ইহা একটী বিরাট উৎসব। যে বৎসর আষাঢ় মাসে ২টী অমাবস্যা (মল মাস) হয় সেই বৎসর বিগ্রহের নূতন মূর্তি স্থাপিত হয়। ইহা সাধারণতঃ ১৯ বৎসর অন্তর হইয়া থাকে। নীলাদ্রিমহোদয়ে (৩৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ইহার বিস্তারিত বিধান আছে।

ইহাই সংক্ষেপে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব সম্বন্ধে মূলতথ্য। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ব্যতীত অন্যান্য বহু মন্দির ও বিগ্রহ বহু প্রাচীনকাল হইতেই পুরীধামে অবস্থিত আছে। পুণ্য সরোবরও কয়েকটী আছে। তদ্ব্যতীত বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের বহু আশ্রম ও মঠও বর্তমান। বর্তমান প্রবন্ধের উহা আলোচ্য বিষয় নহে বলিয়া তৎসম্বন্ধে বিশেষ কোন বর্ণনা প্রদত্ত হইল না, কিন্তু সাধারণের অবগতির জন্য তাহাদের নামোল্লেখ মাত্র করা হইতেছে।

সরোবর—(১) মার্কণ্ডেয় হ্রদ, ইহা জগন্নাথ মন্দির হইতে প্রায় অর্ধ মাইল উত্তরে। ইহার দক্ষিণ তীরে মার্কণ্ডেয়েশ্বরের মন্দির আছে।

(২) ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর—মন্দির হইতে প্রায় ১৷৷০ ক্রোশ দূরে। কথিত আছে এই স্থানেই রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

(৩) নরেন্দ্র সরোবর—এই স্থানে চন্দনযাত্রার সময় নৌকা বিহার হয়।

(৪) শ্বেতগঙ্গা—মন্দিরের উত্তরে। ইহার নিকটে শ্বেতমাধব ও মৎস্যমাধব মূর্তি আছে।

(৫) চক্রতীর্থ—মন্দির হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে সমুদ্রতীরে একটী ক্ষুদ্র সরোবর। কথিত আছে এই স্থানে দারুখণ্ড ভাসিয়া আসিয়াছিল।

অন্যান্য মন্দিরাদি—(১) গুণ্ডিচাগার, মন্দির হইতে প্রায় ২ মাইল। রথযাত্রার সময় জগন্নাথদেব এই স্থানে রত্নবেদীর উপর ৭দিন অবস্থান করেন। ইহার প্রাঙ্গনও বিস্তৃত, দৈর্ঘে ৪৩২ ফিট, প্রস্থে ৩২১ ফিট। ইহারও মন্দির ৪ভাগে বিভক্ত।

(২) যমেশ্বর মন্দির—মূল মন্দিরের অর্ধ মাইল দূরে।

(৩) অলাবুকেশ্বর মন্দির—যমেশ্বর মন্দিরের নিকটে।

(৪) কপালমোচন—অলাবুকেশ্বর মন্দিরের নিকটে।

(৫) লোকনাথ মন্দির—মহামন্দিরের পশ্চিমে, সমুদ্রের নিকট।

(৬) স্বর্গদ্বার—সমুদ্রের উপকূলে—কথিত আছে ইন্দ্রদ্যুম্নের নিকট ব্রহ্মা এইস্থানে স্বর্গ হইতে অবতরণ করেন। এই মন্দির গুলিই প্রাচীন। তদ্ব্যতীত বর্তমানে অনেক ভক্তদের নির্মিত মন্দিরাদি আছে।

মঠ—পুরীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছোট বড় প্রায় ৭৫০ মঠ আছে, তন্মধ্যে শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত শঙ্কর মঠ, আচার্য রামানুজের ভ্রাতা গোবিন্দের নামানুযায়ী এম্বারমঠ, নানকসাহী মঠ, কবীর পন্থীদের মঠ, চৈতন্য মঠ, এবং বিদুরপুরী বা মূলকদাসের মঠ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

বিশ্বকর্মা

নামকরণ—ঋগ্বেদ (১০।৮১-৮২ সূ.) হইতে দেখা যায় যে বিশ্বের সৃষ্টিকর্তাকে ঋষিগণ বিশ্বকর্মা নামে অভিহিত করিয়াছেন। বেদের বিভিন্নস্থানে ইন্দ্র (ঋক্ ৮।৮৭।২), প্রজাপতি (শু. য. ১২।৬১) প্রভৃতি দেবগণও বিশ্বকর্মা নামে অভিহিত হইয়ছেন। যাহা হউক বৈদিকযুগে, বিশ্বকর্মা বলিতে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকেই বুঝাইত, এবং ঋগ্বেদ ১০।৮১-৮২ সূক্তে তাঁহার বর্ণনাও তদ্রূপ। তারপর পৌরাণিকযুগে বিশ্বকর্মা দেবশিল্পীরূপে এক পৃথক দেবতায় পরিগণিত হইলেন। ইনি কারু, তক্ষক্, দৈববর্দ্ধকি, সুধন্বন্ প্রভৃতি নামেও পরিচিত।

উৎপত্তি—দেবগুরু বৃহস্পতির ব্রহ্মচারিণী ভগিনী বরবর্ণিনী অষ্ট-বসুর অন্যতম বসু প্রভাসের স্ত্রী হইলেন। তাঁহার গর্ভেই প্রভাসের পুত্ররূপে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার আবির্ভাব। [আবার অন্যপুরাণে (ব্র. বৈ. ৮) দেখা যায় ব্রহ্মার নাভিদেশ হইতে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ও অষ্টবসুর উৎপত্তি হয়।]

কাহিনী—বিশ্বকর্মার ৪ পুত্র—অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন, ত্বষ্টা ও রুদ্র; আর ছায়া ও সংজ্ঞানাম্নী দুই কন্যা। ইঁহারা সূর্যের স্ত্রী ছিলেন এই সংজ্ঞার সন্তান—বৈবস্বত মনু, যম, ও যমী। (মহা. আদি ৬৬; বিষ্ণু, পু. ১।১৫; মার্ক. পু. ৭৭।১০৬ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

এতদ্ব্যতীত বিশ্বকর্মার অন্যান্য পুত্রকন্যারও নাম দেখা যায় যেমন ত্রিশিরা ও বৃত্র। ইঁহারা ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হ'ন (দেবীভা. ৬।১-৭)।

তাঁহার অন্যতমা কন্যা বর্হিষ্মতীকে রাজা প্রিয়ব্রত বিবাহ করেন। ত্রিশিরার অন্যনাম বিশ্বরূপ। ইনি এক বৃহৎ যজ্ঞ করিতে যাইয়া ইন্দ্রের হস্তে নিহত হ'ন। সেজন্য ইন্দ্র-হন্তা এক পুত্রের জন্য বিশ্বকর্মা ঘোর তপস্যা করেন এবং তাহার ফলে বৃত্রের জন্ম হয়। ইহাই দেব বিশ্বকর্মার পরিচয়। এদ্ব্যতীত বিশ্বকর্মা নামে একজন শিল্পাচার্য বা ঋষি ছিলেন। বাস্তুনামে এক বসুর স্ত্রী অঙ্গিরসীর গর্ভে ইনি জন্ম-গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ইনিই প্রহ্লাদের কন্যা বিরোচনাকে বিবাহ করেন। (কোনমতে হিরণ্যকশিপুর কন্যা রম্ভাকে বিবাহ করেন)। এই বিরোচনার গর্ভে ত্রিশিরা ও ময় নামে দুই পুত্র এবং স্বরেণু নামে এক কন্যা জন্মে। সম্ভবতঃ লঙ্কার রাবণ রাজা এই ময়ের জামাতা এবং ইঁহার রাজধানী সমুদ্রের নিম্নে অর্থাৎ লঙ্কার অপর পারে (বর্তমান দক্ষিণ আমেরিকা ; Hindu America চমণলালকৃত দ্রষ্টব্য)। এই বিশ্বকর্মার এক কন্যা চিত্রাঙ্গদা সুরথরাজাকে বিবাহ করিয়াছিলেন (বায়ু পু. ৬৫)। বানরপতি নলও বিশ্বকর্মার পুত্র (রামা. আ. ১৭)। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে (ব্রহ্ম. ১০) দেখা যায় বিশ্বকর্মার শূদ্রাজাতীয় এক স্ত্রীর গর্ভে মালাকার, কর্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক, কুম্ভকার, কাংসকার, সূত্রধর, চিত্রকার ও স্বর্ণকার নামে নয়জন পুত্রের জন্ম হয়। সম্ভবতঃ এই নামগুলি তত্তৎবংশ বা জাতির নাম, যাহা পরবর্তী কালে উৎপন্ন হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই ঋষিই শিল্পশাস্ত্রের বিশিষ্ট গ্রন্থকার। বাস্তুপ্রকাশ, বাস্তুবিধি, বাস্তুশাস্ত্র, বাস্তুসমুচ্চয়, অপরাজিতা, বাস্তুশাস্ত্র, আয়তত্ত্ব, বিশ্বকর্মীয় প্রভৃতি গ্রন্থের ইনি প্রণেতা (মৎস পু. ২৫২ দ্রষ্টব্য)।

কার্যাবলী—দেব বিশ্বকর্মার কয়েটী বিশিষ্ট কার্য পুরাণাদিতে উল্লিখিত আছে, যথা ইনি ব্রহ্মার জন্য নানারত্নবিভূষিত এক বিমান নির্মাণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার নিকট হইতে কুবের ইহা প্রাপ্ত হ'ন (রামায়ণ, সুন্দর, ৮।৯)। ইনি কুবেরের কৈলাসপর্বতস্থিত অলকাপুরী নির্মাণ করিয়াছিলেন (রামায়ণ কিষ্কি. ৪৬), লঙ্কাপুরী নির্মাণ করিয়াছিলেন (ঐ ৫৮), কুঞ্জরপর্বতে অগস্ত্যের জন্য ভবন নির্মাণ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের জন্য দ্বারকাপুরী ও বৃন্দাবন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দুইটী ধনু নির্মাণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটী দেবতারা ত্রিপুরাসুর বিনাশের জন্য শিবকে এবং অপরটী পরশুরাম বিনাশের জন্য বিষ্ণুকে দান করেন। পরবর্তী কালে রাম শিবের এই ধনু ভঙ্গ করিয়া সীতাকে বিবাহ করেন এবং অন্য ধনুতে জ্যা আরোপ করিয়া পরশুরামের গর্ব চূর্ণ করেন।

ইনিই বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র, শিবের ত্রিশূল, কুবেরের অস্ত্র, কার্ত্তিকেয়ের বল্লম্ প্রভৃতির নির্মাতা এবং ইনিই বৃদ্ধ সূত্রধর বেশে পুরীর জগন্নাথ মূর্তি নির্মাণে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই সুদর্শন চক্রাদি নির্মাণের এক আখ্যায়িকাও আছে। মহাভারতে দেখা যায় ইনি সহস্র প্রকার শিল্পের আবিষ্কারক এবং দেব ও মানবের পূজ্য।

সংক্ষেপে বলা যায় এই দেব বিশ্বকর্মা স্বর্গস্থ দেবতাদের বিমান বাসস্থান, অস্ত্রাদি ও যন্ত্রাদি নির্মাতা। এবং সম্ভবতঃ তাঁহারই অংশজ বা অবতার রূপে আবির্ভূত পূর্বোক্ত ঋষি পৃথিবীতে নানাপ্রকার শিল্পশাস্ত্রের আদি প্রবর্তক। সম্ভবতঃ এই ঋষিই কাশীতে বি[illegible] কর্মেশ্বর নামক এক শিবলিঙ্গের স্থাপনা করেন এবং ইঁহারই পূ

রিয়া তিনি গুরু, গুরুপত্নী ও তাঁহাদের সন্তানদিগকে নানা বস্তুদান করিয়াছিলেন (স্কন্দ, কাশী উ. ৮৬,৯৭)

বিশ্বকর্মার পূর্বোল্লিখিত কাহিনী—যেমন তাঁহার পুত্রদের নাম ত্র, ত্বষ্টা ; কন্যাদের নাম ছায়া, সংজ্ঞা ইত্যাদি ; ইন্দ্র ও বৃত্রের যুদ্ধ -এইগুলিকে অনেকে রূপকজ্ঞানে ইহাদের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বেদের অনেক কাহিনী জ্যোতিষিক তত্ত্বের বা অন্যান্য নৈসর্গিক তত্ত্বের রূপক বর্ণনা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তারজন্য যে পৌরাণিক কাহিনীর অন্তর্গত দেববিশ্বকর্মার এইসব নামের কোন পুত্রকন্যা থাকিতে পারে না, তাহাও বলা যায় না। সুতরাং আমরা পৌরাণিক বর্ণনানুযায়ী বিশ্বকর্মার বিবরণী প্রদান করিতেছি এবং তাহা সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিব।

পূর্বোক্ত বিবরণী দেববিশ্বকর্মার এবং তাঁহারই অবতারকল্প এক ঋষির, যিনি বিশ্বকর্মা নাম গ্রহণ করিয়া ভারতে নানাপ্রকার শিল্পশাস্ত্রের প্রচার করিয়াছেন। উপরিলিখিত গ্রন্থগুলি যে সমস্ত তাঁহারই কৃত তাহা নহে। যিনি শিল্পশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিতেন, তিনি তদানীন্তনকালে 'বিশ্বকর্মা' উপাধি পাইয়াছেন।

ব বিশ্বকর্মার আবির্ভাব কাল কোন্ সময়ে? দেখা যাইতেছে নি প্রহ্লাদের কন্যাকে বিবাহ করেন। সুতরাং সত্যযুগে আবির্ভূত। ং সত্যযুগের শেষে আবির্ভূত এবং আমরা মনুর কাল ৯ হাজার শাঃ পূঃ খ্রীঃ গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং ইনি তাহারও পূর্বে।

দেব বিশ্বকর্মার মূর্তি কি প্রকার হইবে তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বেদে বিশ্বকর্মা অনেক স্থলে ভগবান্ ও পরবর্তী-

কালে পুরাণে বিশ্বকর্মা সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মারূপে পরিচিত হ'ন। সেজ
সাধারণতঃ ব্রহ্মার ন্যায় বিশ্বকর্মারও রক্তবর্ণ, ৪হাত..........প্রভৃতি
কল্পিত হয় এবং ইহাতে কোন দোষ নাই।

পূজাপদ্ধতি—ইঁহার ধ্যানমন্ত্র—

"ওঁ দংশপাল মহাবীর সুমিত্র ধর্মকারক।
বিশ্বকৃৎ বিশ্বধৃক্ চ ত্বং বাসনামানদণ্ডধৃক॥"

"বাং হৃদয়ায় নমঃ, বীং শিরসে স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করি ত
হয় এবং "ওঁ শিল্পকার্যায় দেবায় নমস্তে বিশ্বকর্মণে স্বাহা, বিশ্বকর্মণে
নমঃ" এই মন্ত্রে পূজাদি করিতে হয়। ইঁহার প্রণাম মন্ত্র—

"ওঁ দেবশিল্পিন্ মহাভাগ, দেবানাং কার্যসাধক।
বিশ্বকর্মনমস্তুভ্যং সর্বাভীষ্টফলপ্রদ"।

পূজার বিধি অন্যান্য দেবপূজার ন্যায়। সংকল্পের সময় "........শিল্প
নৈপুণ্যাদি বৃদ্ধিপূর্বক শ্রীবিশ্বকর্মপ্রীতি কামঃ........" ইহা বলিতে হয়।

বাংলাদেশে ভাদ্রমাসের সংক্রান্তি দিবসে বিশ্বকর্মা পূজা হয়।
শিল্প ও কারখানার ব্যক্তিবৃন্দ ঐদিনে সমারোহে তাঁহার পূজা ও
ভোজনাদি উৎসব করে।

শিল্পের গুরু ও আদি প্রবর্তক দেব বিশ্বকর্মার আশীর্বাদে ভা
তাহার লুপ্ত শিল্পকে পুনরুদ্ধার করুক এবং নবনব শিল্পে বিশ্ববি
হউক ও শ্রীমণ্ডিত হউক ইহাই প্রার্থনা।